হাত বাড়ালেই

সুবিধা

Suvida

বর্ষ ৩ সংখ্যা ৯
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

ফেসবুকে suvidapatrika আর
টুইটারে লগ অন করুন
suvidamagazine লিখে

দাম মাত্র দশ টাকা

৩০ দিনের ৩০ সমস্যা সমাধান

ভ্যালেন্টাইনস-এর রান্না

সরস্বতী পুজো স্পেশাল খাবার

ভ্রমণের একাল সেকাল

'সরস্বতী মেয়ে' নয় কেন?

অনন্যা চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার

ক্রস কানেকশন কালেকশন

দুঃশ্চিন্তা কেন হবে অন্তরায়?

উত্তর আছে শেষ মলাটের ভিতরের পাতায়

সম্পাদক
সুদেষ্ণা রায়
মূল উপদেষ্টা
মাসুদ হক
সহকারী সম্পাদক
প্রীতিকণা পালরায়
কাকলি চক্রবর্তী
শিল্প উপদেষ্টা
অন্তরা দে
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী
সুনীল কুমার আগরওয়াল
মূল্য
১০ টাকা

আমাদের ঠিকানা
এসক্যাগ ফার্মা প্রা. লি.
পি ১৯২, লেকটাউন,
তৃতীয় তল, ব্লক - বি
কলকাতা ৭০০০৮৯
email-eskagsuvida@gmail.com

প্রচ্ছদ মডেল : মিমি চক্রবর্তী

Printed & Published by
Sunil Kumar Agarwal
Printed at
Satyajug Employees' Cooperative Industrial Society Ltd.
13,13/1A, Prafulla Sarkar Street,
Kolkata-700 072
RNI NO : WBBEN/2011/39356

চিঠি পত্তর ৪
শব্দজব্দ ৪
সম্পাদকীয় ৫
প্রচ্ছদকাহিনি ৬
হেঁশেল-১ ১৪
হেঁশেল-২ ১৬
কথা ও কাহিনি ১৮
পোশাকি বাহার ২২
কাছেদূরে ২৪
কবিতা ২৭
তুমি মা ২৮
বিশেষ রচনা-১ ৩০
সেলিব্রিটি সংবাদ ৩২
ডাক্তারের চেম্বার থেকে ৩৬
কৌতুক ৩৮
বিশেষ রচনা-২ ৩৯
ভূত-ভবিষ্যৎ ৪২

৬ প্রচ্ছদ কাহিনি

৩০ দিনের ৩০ সমস্যা সমাধান

৩২ সেলিব্রিটি সংবাদ
অনন্যা চ্যাটার্জির সাক্ষাৎকার

৩৬ ডাক্তারের চেম্বার থেকে
থাইরয়েড নিয়ে কিছু কথা

তুমি মা
২৮
শীতের শেষের সমস্যা ও সমাধান

৩৯
বিশেষ রচনা-২
‘সরস্বতী মেয়ে’ নয় কেন!

পোশাকি বাহার
২২ ক্রস কানেকশন কালেকশন

হেঁশেল ১ ও ২
১৪
ভ্যালেন্টাইন ডে’র খাবার ও সরস্বতী পুজোর ভোগ

সহজ ও তথ্যভিত্তিক

সুবিধার জন্মকাল থেকেই আমি পত্রিকাটি পড়ছি ও দেখছি। পত্রিকার দিনে দিনে শ্রী বৃদ্ধি আমাকে আনন্দ দিয়েছে। প্রথম দিকে এই পত্রিকা ত্রৈমাসিক ছিল, এখন প্রতি মাসে থাকি এর অপেক্ষায়। জানুয়ারি মাসে বিয়ে নিয়ে যে গাইডবুক আপনারা দিয়েছেন তা অনেক ভুলে যাওয়া বিস্মৃত নিয়মকে আবার চাগিয়ে তুলেছে। বিয়ের উপর এমন স্পষ্ট, সহজ, তথ্যভিত্তিক রচনার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য আপনাদের সম্পাদক মন্ডলীর।

সুচিস্মিতা ঘোষ, আগরপাড়া

'সুবিধা' বন্ধু

'সুবিধা' আমার অনেক অসুবিধাকে সুবিধার দরজা দেখিয়েছে। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসেও পত্রিকাটির কার্যকরী রস উপভোগ করছি। দাম্পত্য জীবনের নানা তথ্য আমার জীবনকে সুন্দর করেছে এবং অধিকাংশ দম্পতির জীবনের নানা সংকটে সুবিধা পাশে দাঁড়াচ্ছে। আরও এ বিষয়ে নানা সমস্যার দিকগুলি নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হলে সকলের কাছে পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে সুবিধার অগ্রগতি ঘটুক। নবীনদের কবিতা ছোটগল্প, রসরচনা রম্যরচনা এবং সঙ্গীত আলোচনা সহ শিল্পমুখী হোক সুবিধা। মেলা, পরবের উপর তথ্যমূলক খবর, প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা, ভেষজ বিজ্ঞানের উপর আলোকপাত, ফল-ফুল গাছপালা নিয়ে নানা তথ্য এবং সীমিত শব্দের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক বিতর্কও সুবিধার পাতায় স্থান পেতে পারে। পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়লে পত্রিকাটির মূল্য সম্পর্কে আপনারাই বিবেচনা করবেন। সমৃদ্ধ হোক সুবিধার অন্তর আন্তরিকভাবে এই কামনা করি।

ঈশান চন্দ্র মিশ্র, তেঁতুলমুড়ি, কাঁথি

বাঃ ! কী সুবিধা

স্কুলের বর্ষার ছুটিতে একদিন বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওখানেই বিকেলবেলার অবসরে হঠাৎ পত্রিকাটি চোখে পড়ল গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমার পছন্দসই সব লেখা পড়লাম। তারপর সত্যি বলছি, লোভ সামলাতে পারলাম না। চিঠি লিখে টাকা পাওয়ার লোভ নয়, 'সুবিধা' পত্রিকা বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশের লোভ। বর্তমান বাজারে যেখানে সমস্ত জিনিসের দামের পারদ চড়ছে রোজ রোজ, সেখানে এই পত্রিকা নিজের বিনিময় মূল্য মাত্র ১০ টাকা রেখে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে নিঃশব্দ বিপ্লবীর মতো কাজ করে চলেছে। বলতে দ্বিধা নেই, আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক পাঠকেরই বিভিন্ন পত্রিকা পড়ার ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে ধনী কিংবা গরীব সব ধরনের পাঠকই এই ধরনের সর্বগুণ সম্পন্ন পত্রিকাটি অবশ্যই পড়বেন। একজন পাঠক হিসেবে মাননীয়া সম্পাদক মহাশয়াকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সবশেষে কবিতার ছন্দে বলি—
'সুবিধা' মানেই নানা লেখায়
সাজানো রঙিন পত্রিকা,
অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি দাম মাত্র দশ টাকা।

দেবশংকর দাস, কাঁথি

আপনারা অবশ্যই লেখা পাঠাতে পারেন। গল্প, কবিতা, আপনাদের তোলা ছবি, আপনাদের স্থানীয় কোনও বৈশিষ্ট্য নিয়ে লেখা, ভ্রমণ কাহিনি। মনোনীত হলে সুবিধা-য় ছাপা হবে। তবে যা পাঠাবেন কপি রেখে পাঠাবেন। —সম্পাদক

সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে . শব্দজব্দ ২০ শ্যামদুলাল কুণ্ডু

১	২			৩	■	■	৪
■		■	■		■	৫	
৬		■	৭		■	■	
	■	৮	■	৯	১০		
১১			১২	■		■	
	■	■	১৩		■	১৪	
১৫		■		■	■		■
	■	■	১৬				

পাশাপাশি

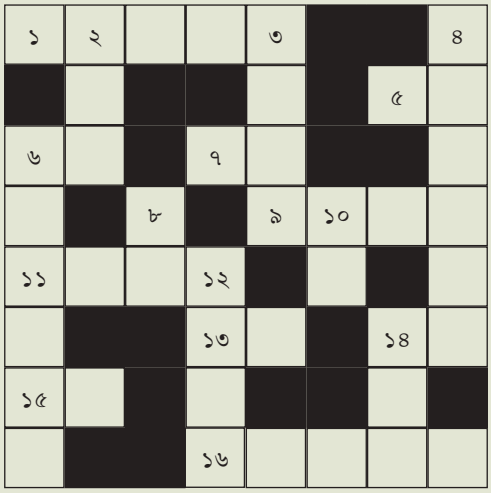

১। অনুকূলচন্দ্র শিষ্যদের কাছে যে নামে পরিচিত। ৫। অগ্নিদেবের স্ত্রী। ৬। অনুযায়ী, 'পুলিশের হুকুম—সব গাজন ফিরে গেল।' (হুতোম প্যাঁচার নকশা)। ৭। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্প-নিয়ে এক সত্যজিৎ-চিত্র। ৯। এই সেন সাহিত্যিক বিখ্যাত হলেন সেকালের মাসিক 'ভারতবর্ষ'-এর সম্পাদক হিসাবে। ১১। 'বাংলাদেশ'-এর জাতীয় কবি। ১৩। সংস্কৃত কীল, 'পাটে পাটে সন্ধি করি,—হানে সারি সারি' (দ্বিজ বংশীদাস)। ১৪। ধ্বন্যাত্মক, দ্বিত্বে বাতাসের শব্দ। ১৫। '—দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে।' ১৬। 'অপরাজিত' ও 'পরশ পাথর'—এর সুরকার।

উপরনিচ

২। একালের বিখ্যাত এক কবি ও গীতিকার। ৩। পৌরাণিক এক অসুর, যার প্রতি ফোঁটা রক্ত থেকে আর এক অসুরের জন্ম হত। ৪। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকও বাগীশ্বরী অধ্যাপক ছিলেন এই ডক্টর রায়। ৬। শ্রীকৃষ্ণ, এই তর্কালঙ্কার ছিলেন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ও বিদ্যাসাগরের সতীর্থ ও বন্ধু। ৮। আনন্দবাজারের প্রাক্তন সাংবাদিক পরে ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এই রায়। ১০। ক্ষুদ্র, 'গৃহে দুইজন দেখে—পদচিহ্ন' (চৈতন্য চরিতামৃত)। ১২। 'মনসা মঙ্গল'-এর চাঁদ সদাগরের পুত্র বা বেহুলার স্বামী। ১৪। সপ্তম শতাব্দীর গৌড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, সম্ভবত গুপ্তবংশের শেষ 'রাজা'।

সমাধান শব্দজব্দ ২০

১শ্রী	২শ্রী	ঠা	কু	৩র	■	■	নী৪
■	জা	■	■	ক্ত	■	৫স্বা	হা
৬ম	ত	■	৭দে	বী	■	■	র
দ	■	৮চা	■	৯জ	১০ল	ধ	র
১১ন	জ	রু	১২ল	■	ঘু	■	ঞ্জ
মো	■	■	১৩খি	ল	■	১৪শ	ন
১৫হ	রি	■	ন্দ	■	■	শা	■
ন	■	■	১৬র	বি	শ	ঙ্ক	র

আমাদের জীবন, শুধু শহুরে জীবনই নয় শহরতলী এমনকি গ্রামে গঞ্জেও জীবনধারার পরিবর্তন অনেকদিন ধরেই শুরু হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যনীয়। রান্নার জন্য এখন কাঠ, কয়লা, গুল, ঘুঁটের জায়গা নিয়েছে গ্যাস, কখনও কেরোসিন আর ইলেকট্রিসিটি। মিক্সি, মাইক্রোওয়েভ, ও টি জি, আভেন, ইন্ডাকশন কুকার এখন কত মেশিনই যে রয়েছে জীবনটা দ্রুত ও সমস্যাহীন করে তোলার জন্য। একদিকে কাপড় কাচার ওয়াশিং মেশিন, আবার অন্য দিকে বাসন ধোওয়ার ডিশ ওয়াশার। এছাড়া ফোন, ইন্টারনেট, টিভি, আইপড, ডিভিডি প্লেয়ার, মেশিনে মেশিনে এখন জীবন ছয়লাপ। যতই জীবনের সমস্যা সুরাহার জন্য মেশিন আসুক না কেন, সেই সঙ্গে নতুন সমস্যাও দেখা দেয়। তাই এবারের প্রচ্ছদকাহিনি আধুনিক জীবনের ৩০টি সমস্যা ও সমাধান নিয়ে। ফেব্রুয়ারি মাস মানেই বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। ফেব্রুয়ারি আবার প্রেমেরও মাস। একদিকে বাঙালির প্রেম দিবস সরস্বতী পুজো অন্যদিকে ভ্যালেন্টাইনস ডে। বহুদিন ধরেই মনের মধ্যে একটা কথা খচখচ করত। আমরা যখনই কোনও মেয়েকে প্রশংসা করি, ভাল বলি, বলি, 'লক্ষ্মী মেয়ে'। অথচ সরস্বতীও তো গুণী, নাচ, গান বাজনা, বিদ্যা সবেতে পারদর্শী। তাহলে 'সরস্বতী মেয়ে হও' বলি না কেন? এ নিয়ে যেমন রয়েছে পর্যালোচনা, তেমনই 'ভালবাসা'র এক অন্য দিক নিয়েও রয়েছে লেখা। আমি ছবি তৈরি করি অর্থাৎ সিনেমা। এ মাসেই অভিজিৎ গুহ ও আমার ছবি 'যদি লভ দিলে না প্রাণে' মুক্তি পেতে চলেছে। ওই ছবি এক 'অবুঝ' নারীর প্রেম নিয়ে। ছবির চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অবুঝ মেয়ে' উপন্যাস থেকে। বহুদিন পর আবার সাহিত্য ভিত্তিক গল্প থেকে আমরা ছবি করলাম। সাহিত্যিকের গল্পে থাকে জোরদার প্লট, সেই প্লট ছবির চিত্রনাট্যে সাহায্য করে। তবে কেউ যদি মনে করেন, গল্পে বা উপন্যাসে যা লেখা আছে সিনেমায় হুবহু তার কার্বন কপি দেখবেন, সেটা কিন্তু ভুল হবে। ফিল্মমেকার একটি গল্প নিয়ে, তা নিজের মতো করে বিশ্লেষণ করেন এবং তা ভাগ করে নেন চিত্রনাট্যকারের সঙ্গে। তারপর অভিনেতা, অভিনেত্রী, চিত্রগ্রাহক, শিল্প নির্দেশক, সম্পাদক, সঙ্গীত পরিচালক, শব্দ পরিকল্পক সবার অবদান মিলে তৈরি হয় ছবি। এই ছবি দর্শকের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছনোর পিছনে থাকে প্রযোজকের ভূমিকা। যিনি যত ক্রিয়েটিভ প্রযোজক, তিনি একটি ছবিকে ততটাই জায়গা করে দিতে পারেন। আজকের দিনে প্রযোজক শুধু টাকা দিয়েই খালাস নন, তিনি ছবি তৈরির, ছবি উপস্থাপনার অন্যতম নায়কও।

সুদেষ্ণা রায়

সুবিধার গ্রাহক হতে চান

সুবিধা এখন মাসিক হল। বছরে ১২টি সংখ্যা!
আপনারা যদি নিয়মিত গ্রাহক হতে চান তাহলে নিচের কুপনটা ভরে সঙ্গে এক বছরের সাবস্ক্রিপশন হিসাবে, মোট একশো টাকার একটি 'A/C Payee' চেক সহ আমাদের দফতরে পাঠিয়ে দিন। চেক হবে Eskag Pharma Pvt Ltd এই নামে।

১২টি সংখ্যা মাত্র ১০০ টাকায়। এই দুর্মূল্যের বাজারে করুন সাশ্রয়

নাম .....বয়স.....

ঠিকানা .....

কী করেন .....দূরভাষ.....

আমাদের ঠিকানা
সম্পাদক, সুবিধা
প্রযত্নে : এসক্যাগ ফার্মা প্রাঃ লি,
পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক বি
কলকাতা : ৭০০০৮৯
email : eskagsuvida@gmail.com

পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা বিনামূল্যে ডাকযোগে পৌঁছে দেওয়া হবে

৩০দিনের ৩০সমস্যা সমাধান

চাকরিরতা হোন কিংবা হোমমেকার—সংসারের টুকিটাকি সমস্যা পিছু ছাড়তে চায় না। তিরিশ দিনে তিরিশ রকমের সমস্যা। আজ কাজের লোকের তো কাল ফ্রিজ, পরশু আবার অ্যাকোয়ারিয়াম-এর সমস্যা! একটার পর একটা ঝামেলা যেন প্রস্তুত হয়েই থাকে। যদিও বেশিরভাগ সমস্যা থেকে দূরে থাকা যায় একটু সতর্কতার সঙ্গে চললেই। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করলেই অনেক চিন্তামুক্ত থাকা যায়। আর সমস্যা যদি গ্যাজেটের হয় তাহলে নিজেদের তেমন কিছু করারও থাকে না। তখন পেশাদার ব্যক্তিরই দরকার হয়। কাজেই আগেভাগে কী কী ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা থেকে দূরে থাকতে পারবেন আর হলেই বা কী করবেন জেনে নিন। আশা করি কাজে লাগবে। অনেক বিচার বিবেচনা করে তথ্য সংগ্রহ করে লিখেছেন **কাকলি চক্রবর্তী**

সমস্যা ১

জলের কল থেকে অনবরত টিপ টিপ করে জল পড়া। কখনও কখনও খোলা বা বন্ধ করার সময় অদ্ভুত আওয়াজ বেরনো।

সমাধান

কলের থেকে টপ টপ করে জল পড়ার কারণ ওয়াশার খারাপ হয়ে যাওয়া। কাজেই সমস্যা দেখলেই ওয়াশার পালটে নিতে হবে। ওয়াশারের সেটিং ঠিক না হলেও হতে পারে এমন সমস্যা। সেক্ষেত্রে সেটিংটা ঠিক করে নিতে হবে। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়া আটকানোর জন্য জোরে চাপ দিয়ে কল আটকাতে যাবেন না। এতে ওয়াশার কেটে সমস্যা আরও বাড়তে পারে। কল ভাল রাখার জন্য এর ওপর দিকে কোনও ভারী জিনিস বসানো উচিত নয়। কলের মুখে বসানো জালি মাঝে মধ্যে খুলে ভিনিগার দিয়ে পরিষ্কার করলেও কল অনেক দিন ভাল থাকে।

সমস্যা ২

কিচেন চিমনির ব্লোয়ার ভারী হয়ে ঠিকমতো কাজ না করা। পাইপের ভেতর পাখির বাসা বাধা।

সমাধান

কিচেন চিমনির ব্লোয়ার নিয়মিত পরিষ্কার করলে এ সমস্যা হয় না। তবে নিজে নয়, কোনও প্রশিক্ষিত ব্যক্তিকে দিয়ে ব্লেয়ার পরিষ্কার করাতে হবে। চিমনির যে পাইপ দিয়ে তেল, কালি বাইরে বেরিয়ে যায় তার শেষ প্রান্তে একটা নেট মতো বসানো থাকে। কোনও কারণে তা খুলে গেলে সেখান থেকে পাখি বা পোকামাকড় ঢুকে পড়তে পারে। তাই মাঝে মধ্যে চেক করে নিন নেটটা ঠিক জায়গায় আছে কি না। চিমনি নতুনের মতো ঝকঝকে রাখতে সপ্তাহে অন্তত ১দিন কেরোসিন তেল বা ভিনিগার দিয়ে পরিষ্কার করুন। ভাজাভুজির সময় দুদিকের ব্লোয়ার ব্যবহার করুন। নয়ত একদিকে চাপ পড়ে চিমনি খারাপ হতে পারে।

সমস্যা ৩

কাজের লোকের সমস্যা। তাঁর ইচ্ছেমতো সময়ে আসা। না বলে কামাই করা। ঘর থেকে টুকটাক জিনিস উধাও হয়ে যাওয়া।

সমাধান

প্রতিটি গৃহিনী কম-বেশি এই সমস্যায় জেরবার। সকাল ৮টায় আসার কথা, কাজের লোক ঢুকল ৯টার সময়। ফলে সারাদিনের কাজের রুটিন নষ্ট হয়ে যায়। গিন্নির মেজাজ সপ্তমে চড়া তখন স্বাভাবিক। তাই প্রথমেই কাজের লোকের সময় বেঁধে দিন। ১০-১৫ মিনিটের বেশি যেন দেরি না হয় সেটা বলে দিন। না বলে কামাই করলে সেদিনের টাকা কাটা যাবে বলে নিয়োগের সময় শর্ত আরোপ করুন। মাইনে দেওয়ার সময় যদি টাকা কাটতে রুচিতে বা বিবেকে বাঁধে তা-ও কাটুন। পরে ওই টাকাটা দিন বাড়ির ছেলেপুলেদের জন্য কিছু নেওয়ার জন্য। মাইনের সঙ্গে দিলে তাঁকে আর শোধরাতে পারবেন না। আর কাজের লোক নিয়োগের আগে অবশ্যই তাঁর ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড ইত্যাদির জেরক্স সংগ্রহ করুন পরিচয়পত্র হিসেবে। খবরের কাগজে তো দেখছেন কিছু কিছু কাজের লোকের গৃহকর্তা ও বা কর্তৃর ওপর অত্যাচারের খবর। আর এক কপি পরিচয়পত্র জমা দিয়ে রাখুন স্থানীয় থানায়। প্রয়োজনে সেন্টার থেকেও কাজের লোক নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে খরচ বেশি হলেও নিরাপত্তা থাকে অনেকটাই।

সমস্যা ৪

রান্নাঘরের প্রাণকেন্দ্র হল ফ্রিজ। কিন্তু যদি কোনও কারণে ফ্রিজে দুর্গন্ধ হয় তাহলে প্রাণ ওষ্ঠাগত।

সমাধান

ফ্রিজের শেলফ এবং ড্রয়ারগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা দরকার। অনেক সময়ই খাবার দাবার কিংবা দুধ ইত্যাদি রাখার সময় ধাক্কা লেগে ফ্রিজের মধ্যে সেটা পড়ে যায়। এ ধরনের জিনিস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নরম কাপড় ভিজিয়ে মুছে নিন। ড্রয়ার খোলা গেলে তা বাইরে এনে ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে ধোয়া যেতে পারে। কোনও খারাপ খাবার বা ফল, সবজি ফ্রিজে রাখা চলবে না। তা সত্ত্বেও দুর্গন্ধ হলে জল ও ভিনিগার একসঙ্গে মিশিয়ে কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে। ফ্রিজের মধ্যে লেবু কেটে রাখলেও দুর্গন্ধ দূর হয়। কাপড়ের পুট লিতে খাবার সোডা ভরে ফ্রিজের ভেতর কোনও জায়গায় রেখে দিলেও দুর্গন্ধ কমে যায়। চেষ্টা করবেন 'এ' স্টার লেবেল সম্পন্ন ফ্রিজ কিনতে।

সমস্যা ৫

মাইক্রোওভেন-এ রান্না করতে গিয়ে কিছু উথলে পড়ে তা আটকে থাকা কিংবা হঠাৎ করে আগুন ধরে যাওয়া।

সমাধান

যদি মাইক্রোওভেন-এ কোনও কিছু পড়ে শক্ত হয়ে আটকে থাকে তাহলে এক গ্লাস জল মাইক্রোতে ফুটিয়ে নিন। দেখবেন শক্ত হয়ে থাকা জিনিস আলগা হয়ে যাবে। তারপর নরম কাপড় দিয়ে মুছে নিলেই সমস্যা দূর হবে। কোনও কিছু ওভারকুক করা হলে মাইক্রোআভেনে আগুন ধরে যেতে পারে। তাই কখনওই ওভারকুক করা উচিত নয়। আগুন ধরলে আগে প্লাগ থেকে কর্ড খুলে নিতে হবে। এছাড়াও খেয়াল রাখতে হবে, মাইক্রোআভেন চালানোর সময় যেন দরজা ঠিকমতো বন্ধ করা থাকে এবং কর্ড কখনও জলের আশপাশে না থাকে। মাইক্রোওভেনে কখনই আস্ত ডিম, বেবি বটল কিংবা সিলড কন্টেনার দেওয়া চলবে না।

সমস্যা ৬

ওয়াশিং মেশিনের ভিতর ছত্রাক জন্মানো কিংবা মেশিনের কাজের গতি কমে যাওয়া।

সমাধান

ফ্রন্ট লোডিং মেশিনে ছত্রাক জন্মানোর আশঙ্কা থাকে যথেষ্ট। স্যাঁতসেতে জায়গায় ওয়াশিং মেশিন রাখা এবং অনেকক্ষণ ধরে জামাকাপড় ভিতরে রাখা এর কারণ হতে পারে। তাই প্রতিবার ব্যবহারের পর শুকনো

কাপড় দিয়ে ভেতরটা মুছে নেওয়া দরকার। খানিকক্ষণ দরজা খুলে রাখলেও ভেজাভাব কেটে যাবে। আর সপ্তাহে না হলেও ১৫ দিনে একদিন ফিল্টার পরীক্ষা করে দেখা দরকার যে ভেতরে কোনওরকম ময়লা জমেছে কিনা। ময়লা জমলে মেশিনের গতি কমে যায়।

সমস্যা ৭

গ্যাসে ঠিকমতো আগুন না হওয়া অথবা রান্না করার বাসনের নিচে কাঠে রান্নার মতো কালি পড়া।

সমাধান

রান্না করতে গিয়ে ভাতের ফ্যান, দুধ এসব পড়ে গ্যাসের বার্নারের ছিদ্র বন্ধ করে দেয়। তার ফলেই কখনও কখনও এক দিক থেকে আগুন বেরয়, আবার রুটি করার সময় আটার গুঁড়ো পড়েও গ্যাস বেরনোর মুখে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে বাসনের নিচে কালি পড়ে যায়। এসব ঠেকানোর উপায় হল বার্নারে কিছু পড়লে সঙ্গে সঙ্গে পেপার টাওয়েল দিয়ে মুছে নেওয়া। ছিদ্রগুলোর মুখ পরিষ্কার করার জন্য নরম ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিতে হবে। তবে টুথপিক ব্যবহার করবেন না। কারণ তা ভেঙে গেলে মুখ আরও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

সমস্যা ৮

রান্নাঘরে মাছি, আরশোলা, পিঁপড়ে, টিকটিকির উৎপাত। খাবার দাবার কিছুই নিশ্চিন্তে রাখার উপায় থাকে না।

সমাধান

এ সমস্যায় জেরবার হন অনেকেই। একবার পোকামাকড়ের উৎপাত শুরু হলে তা ছাড়ানো সহজ হয় না। তাই প্রথম থেকেই রান্নাঘর সুরক্ষিত রাখার জন্য জল বেরনোর সমস্ত পাইপ লাইনের মুখে পেস্টিসাইড দিন। অন্তত একদিন অন্তর এটা করতেই হবে। জানলা, দরজায় কোনও ফাটাফুটি থাকলে তা বন্ধ করে দিন। রান্নাঘরের তাকগুলোর ভেতর কাগজের মধ্যে বোরিক অ্যাসিড মুড়ে রেখে দিলেও পোকামাকড় হবে না। তৈলাক্ত জায়গা পোকামাকড়দের খুব পছন্দের। তাই রান্নার পরে গ্যাস স্টোভ ও তার আশপাশ ভাল করে সাবান-জল কিংবা কেরোসিন দিয়ে মুছে নিন।

সমস্যা ৯

শখের অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে জীবাণু জন্মানো। হঠাৎ করে মাছ মরে যাওয়া।

সমাধান

অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছ ভাল রাখার জন্য সপ্তাহে একদিন করে খানিকটা জল পাল্টে দিতে হবে। এতে মাছ ভাল থাকবে। জানলা, দরজা থেকে সরাসরি রোদ এসে যেন অ্যাকোয়ারিয়ামে না পড়ে সেভাবে ঘরে রাখবেন। এই রোদই জীবাণু জন্মানোর জন্য দায়ী। তবে ভিতরে স্বাভাবিকভাবে কিছু শ্যাওলা জন্মায়। এগুলো ততটা ক্ষতিকর না হলেও মাঝে মধ্যে পরিষ্কার করা দরকার। আর খুব বেশি খাবার ওদের দেওয়া উচিত নয়। বেশি খাবার মাছের জন্য খুবই ক্ষতিকর। আর মিনারেল ওয়াটার ছাড়া কোনও জল অ্যাকোয়ারিয়ামে ব্যবহার করবেন না।

সমস্যা ১০

কাঁসা-পিতলের বাসনের হতশ্রী অবস্থা। ঘরের পুজো-আচ্চার দিনে পরিবারের পাঁচজনের সামনে তা বের করতে অস্বস্তিবোধ করেন। তাহলে?

সমাধান

কাঁসা-পিতলের বাসন ভিনিগার, নুন এবং ময়দা মিশিয়ে মাজলে ঝকঝকে হয়ে যায়। আবার ব্রাসো জলে গুলে নিয়ে তা দিয়ে মাজলেও কাজ দেয়। কখনওই ডিশওয়াশারে এ ধরনের বাসন দেবেন না। আরও বেশি নতুনের মতো করতে চাইলে কাঁসার বাসনে অলিভ অয়েল মাখিয়ে ভাল করে ঘষে দিন। কাঁসা, পিতলের বাসন ধোয়ার পর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিন, ভেজাভাব কাটানোর জন্য। কখনই যেন খোলা হাওয়ায় শুকোনোর চেষ্টা করবেন না, এতে দাগ আরও ধরে যেতে পারে।

সমস্যা ১১

দুদিন অন্তর মিক্সির ব্লেড ভেঙে যাওয়া, পেস্ট করার সময় এটা-ওটা ব্লেডের ফাঁকে আটকে থাকা।

সমাধান

মিক্সির লক ঠিকমতো আটকানো না হলে অর্থাৎ জার যদি লুজ থাকে তাহলে মোটরের ব্লেড ভেঙে যেতে পারে। বারবার হওয়ার অর্থ অসতর্কভাবে লক না করে জার বসানো। কোনও কিছু পেস্ট করার পর সামান্য জল দিয়ে আবার মিক্সিটা একটু চালিয়ে নিলে ব্লেডের ফাঁক থেকে সব কিছু বেরিয়ে যায়। এছাড়াও মিক্সি যাতে

ঠিকমতো চালু থাকে সে জন্য পেস্ট করার যাবতীয় কিছু রাখতে হবে রুম টেম্পারেচারে, পুরোপুরি জার ভরে নিয়ে মিক্সি চালানো ঠিক নয়। স্পিড একটু একটু করে বাড়ানো দরকার। এক নাগাড়ে মিক্সি চালানোও উচিত নয়। ২০ মিনিট চালানোর পর কিছুক্ষণ বন্ধ রেখে আবার চালালে মিক্সি ভাল থাকে।

সমস্যা ১২

দামি এসি মেশিন ঘরে লাগানোর পর ২-৪ মাস যেতে না যেতেই ঘর আশানুরূপ ঠাণ্ডা না হওয়া। দ্রুত ঠাণ্ডা করার জন্য ১৫-১৬তে দিলেও তাপমাত্রার হেরফের হয় না।

সমাধান

এসি মেশিনের বাইরের দিকে যে যন্ত্রপাতিগুলো থাকে তাতে খুব বেশি ময়লা জমলে এয়ার ফ্লো কমে যায়। তখন ঠাণ্ডা হতে সময় লাগে। আর টেম্পারেচার কখনওই ১৮-র নিচে নামানো ঠিক নয়। এতে তাপমাত্রা কমে না বরং মেশিনের ওপর চাপ পড়ে ও তা খারাপ হয়ে যায়। যদি ১৮-তেও ঘর ঠাণ্ডা না হয়, তাহলে যেখান থেকে কিনেছেন সেই দোকানের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। প্রয়োজনে মেশিন পাল্টে দিতে বলুন। যদি তাঁরা রাজি না হন তাহলে কনজিউমার ফোরামে বিষয়টা জানাতে ভুলবেন না। এছাড়া কোনও কোম্পানির সঙ্গে মেন্টেনেন্স কন্ট্র্যাক্ট করাও অতি আবশ্যক।

সমস্যা ১৪

ননস্টিক বাসনের কোটিং উঠে যাওয়া।

সমাধান

স্টিল উল বা মেটাল স্ক্রাবার দিয়ে ননস্টিক বাসন মাজলে কোটিং উঠে যেতে পারে। কোনও মেটালের হাতা-খুন্তি ব্যবহার করলে কিংবা বেশি টক জাতীয় খাবার রান্না করার ফলেও একই সমস্যা হতে পারে। কাজেই এসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। খুব বেশি তাপমাত্রায় রান্না করলেও কুকওয়্যার-এর সমস্যা দেখা দিতে পারে। ননস্টিক বাসনে রান্না করার পর পুরোপুরি ঠাণ্ডা করে

মাজলে কোটিং দীর্ঘস্থায়ী হবে। আর কোটিং যদি উঠেই যায় তাহলে তা ব্যবহার করা চলবে না। কারণ তখন পলিমারের কোটিং খাবারে মিশে শরীরের ক্ষতি করে।

সমস্যা ১৫

শখের সিলভার জুয়েলারিগুলোর রং নষ্ট হয়ে যাওয়া।

সমাধান

সিলভার বা রুপো বেশিক্ষণ বাতাসের সংস্পর্শে থাকলে কালো হতে বাধ্য। তাই এর সৌন্দর্য ধরে রাখতে অনেক সময় ধরে ব্যবহার করা উচিত নয়। তবে যদি দাগ ধরে যায় তাহলে সামান্য গরম জলে অল্প পরিমাণে তরল সাবান গুলে নরম কাপড় দিয়ে ঘষে নিতে হবে। রুপোর গয়না রাখার সময় দোকান থেকে দেওয়া কাগজেই মুড়ে রাখতে হবে। খবরের কাগজ বা প্লাস্টিকের প্যাকেটে রুপোর গয়না রাখা উচিত নয়। রুপোর গয়না পরিষ্কার

সমস্যা ১৩

বেড়াতে যাওয়ার সময় আলমারি থেকে ক্যামেরা বের করে মাথায় হাত। ব্যাটারি যে চার্জই নিচ্ছে না!

সমাধান

এটা খুব কমন সমস্যা। ক্যামেরা সারা বছর আলমারিতে বন্দি থাকে, বেড়াতে যাওয়ার আগে তার খোঁজ পড়ে। আলমারিতে তুলে রাখার আগে ক্যামেরার ব্যাটারি খুলে রাখলে এই সমস্যা হয় না। তাছাড়া যে ব্যাগে ক্যামেরা থাকে তার মধ্যে ২-৩ টে সিলিকা জেল-এর প্যাকেট রেখে দিলে ভেতরের আর্দ্রতা নষ্ট হয়। ক্যামেরাও ভাল থাকে। খুব বেশি স্যাঁতসেতে আবহাওয়া কিংবা অতিরিক্ত তাপমাত্রা কোনওটাই ক্যামেরা রাখার জন্য সুবিধাজনক নয়। মাঝে মধ্যে ক্যামেরার এল সিডি পরিষ্কার করতে হবে নরম টিস্যু পেপার দিয়ে।

করার জন্য টুথপেস্ট, বেকিং সোডা কখনওই ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে গয়না খারাপ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সিলভো বলে একটি তরল পালিশ আছে, যা রুপো পরিষ্কারে অব্যর্থ।

সমস্যা ১৬

কাপড়ে লাগা মরচের দাগ থেকে বেসিনে জলের দাগ কখনও আবার লিপস্টিকের দাগ, তুলবেন কী করে?

সমাধান

এক এক ধরনের দাগের এক এক রকম দাওয়াই। মরচের দাগ ধরলে নুন ও লেবুর রস মিশিয়ে লাগান। বেসিন থেকে জলের দাগ তোলার জন্য ভিনিগার দিয়ে ঘষে নিন। দাঁতে হলুদ দাগ হলে সপ্তাহে একদিন নুন-লেবুর রস বা টুথপেস্ট-এর সঙ্গে সামান্য ফিটকিরি মিশিয়ে দাঁত মাজুন। সোনার চুড়ির দাগ তুলতে হলে হলুদ জলে খানিকক্ষণ ভিজিয়ে রেখে ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিন। পেনের কালি কিংবা কফির দাগ হলে ঠান্ডা জলে কাপড় ভিজিয়ে ঘষে নিন। এতে কাজ না হলে ডিটারজেন্ট লাগিয়ে খানিকক্ষণ রেখে ঘষে দিন। আর পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করুন লিপস্টিকের দাগ তুলতে।

সমস্যা ১৮

মাছ রান্না নিয়ে নানা সমস্যা। কখনও মাছ ভাজা ভেঙে যায়, কখনও বা ফেটে গিয়ে হাতে তেল ছলকে পড়ে ফোসকা। এ সমস্যার মোকাবিলা কী করে করবেন?

সমাধান

আঁশ ছাড়া মাছ ভাজতে গেলে ছিটে উঠে ফোসকা পড়া যেন স্বাভাবিক। ভাজার আগে মাছগুলোয় তেল মাখিয়ে নিলে এই সমস্যা হয় না। বাজার থেকে আনার পর যদি মনে হয় মাছ একটু নরম তাহলে মাছে নুন, হলুদের সঙ্গে সামান্য হিং মিশিয়ে নিন। তাজাভাব ফিরে আসবে। ভাজার আগে মাছে সামান্য লেবুর রস কিংবা ভিনিগার মাখিয়ে নিলে কাঁচা তেলে ছাড়লেও মাছ ভাঙবে না। মাছ ধোয়ার পর গন্ধ তাড়ানোর জন্য হাতে একটু হলুদ গুঁড়ো ঘষে নিন।

সমস্যা ১৯

সোনার চেয়েও এখন দামি হল ভাল কাঠের ফার্নিচার। এতে বাচ্চার আঙুলের দাগ, বা তেলের দাগ লেগে, কিংবা ঘরের ধুলো-বালি জমে শ্রী পাল্টে গেলে মন খারাপ হয়। কিন্তু সমাধান আছে।

সমাধান

কাঠের ফার্নিচারের প্রধান শত্রু জল, কোনওভাবেই এতে জল লাগাবেন না। দাগ-ছোপ বা ধুলো বালি তোলার জন্য লেবুর রস আর অলিভ অয়েল মিশিয়ে সুতির তুলো না ওঠা কাপড় দিয়ে ঘষে নিন। তাতেও কাজ না হলে ২:৪ অনুপাতে ভেজিটেবল অয়েল আর ভিনিগার ঈষদুষ্ণ জলে গুলে তাই দিয়ে কাঠের ফার্নিচার ভাল করে পরিষ্কার করে নরম কাপড় দিয়ে মুছবেন। পারলে ওয়্যাক্স পালিশ লাগান বছরে তিন থেকে চারবার।

সমস্যা ২০

ছাদের গাছগুলোতে জল না দিলেই নয়। অথচ জল জমে ছাদ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিংবা ছাদে ফাটল দেখা দিচ্ছে।

সমাধান

এ কথা ঠিক, ছাদ বাগান শুধু পরিবেশ দূষণ রোধ করে না, ঘর ঠাণ্ডা থাকে বলে ইলেকট্রিসিটি খরচও বাঁচায়। কিন্তু সেজন্য ছাদে গাছ বসানোর আগে ড্রেনেজ ব্যবস্থা দেখে নিতে হবে। অতিরিক্ত জল যেন সহজেই বেরিয়ে যায় তা দেখতে হবে। খুব বড় গাছ লাগালে তার শিকড় ছাদ নষ্ট করতে পারে। তাই ছোট সাইজের গাছ বসাবেন। তাছাড়াও বড় গাছ হলে ছাদে চাপ পড়ে। সেটাও খারাপ। ছাদের জন্য সম্ভব হলে মাটির বদলে প্লাস্টিকের পট কিনুন, এর ওজন কম আবার কাজও মাটির পটের মতোই।

সমস্যা ২১

দেওয়ালে ড্যাম্প ধরা। স্যাঁতসেতে থাকার জন্য বিশ্রী দাগ হওয়া। কখনও কখনও সরু সরু ক্র্যাক ধরা।

সমাধান

অনেক সময় জলের পাইপ লাইন চুইয়ে জল লেগে দেওয়ালে ড্যাম্প ধরতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমেই দেখে নিন পাইপ লাইন ঠিক আছে কি না। দেওয়ালে শ্যাঁওলা, গাছ জন্মালেও একই সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই বাইরের দিকের দেওয়াল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। আর বেশিরভাগ দেওয়ালের সরু ফাটল নিয়ে তত চিন্তার কিছু নেই। প্লাস্টার ঠিক মতো না হলে এ সমস্যা হতে পারে। এরকম হলে খানিকটা প্লাস্টার অফ প্যারিস গুলে লাগিয়ে দিতে পারেন। আর ফাটল যদি বাড়তেই থাকে তবে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নিন।

সমস্যা ২২

গাড়ি কেনার পর কখনও স্টার্ট নিতে দেরি হওয়া তো কখনও বেশি তেল পোড়ার সমস্যা দেখা দেওয়া।

সমাধান

গাড়ির সমস্যা থেকে দূরে থাকার প্রধান এবং অন্যতম শর্ত হল

সমস্যা ১৭

দামি কার্পেটেও ধুলো-বালি জমে দুর্গন্ধ হওয়ার জন্য গৃহস্থের ঘরে বাস করাই অসহ্য হয়ে ওঠে। এর প্রতিকার কী?

সমাধান

কার্পেট নিয়মিত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করুন। তা না হলে শুধু ধুলো-কালির স্তর নয় এতে জমবে তেলও। চা, কোল্ডড্রিংক্স পড়লে সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা ভিনিগার দিয়ে মুছে নিন। তারপর ডিটারজেন্ট গুলে সফট টিস্যু দিয়ে মুছে নিন। নয়তো একবার চ্যাটচেটে হয়ে গেলে তা ছাড়ানো মুশকিল। কার্পেটের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করার সময় ভ্যাকুয়াম ব্যাগে বেকিং সোডার গুঁড়ো ভরে দিন।

মেন্টেন্যান্স। মাসে অন্তত একবার টায়ার-এর প্রেশার এবং কন্ডিশন চেক করতে হবে। চেক করতে হবে লাইট, উইন্ডশিল্ড ওয়াশার ফ্লুইড। তিনমাসে একবার চেক করতে হবে ইঞ্জিন অয়েল এবং ফিল্টার, পাওয়ার স্টিয়ারিং, ব্রেক, ব্যাটারি, বেল্ট, এগজস্ট এবং ফুয়েল ফিল্টার অর্থাৎ সার্ভিসিং করাতে হবে। এসব নিয়ম মেনে চললে দেখবেন গাড়ির কোনও সমস্যা ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

সমস্যা ২৩

ধুলো জমার সমস্যা কী কম। খোলা বইয়ের তাক, খাটের হোডবোর্ড তো আছেই এমনকী বন্ধ তাক যাতে ফাঁক ফোকড় আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না সেখানেও দু দিন অন্তর ধুলো জমে যায়।

সমাধান

বাইরের দরজা-জানলা বন্ধ রেখে এর সমাধান সম্ভব নয়। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘরের জিনিসে ধুলো পড়ার কারণ ঘরের লোকজন এবং জামাকাপড়। বাইরে থেকে ঘুরে আসার পর সমস্যা হয়। তাই ব্যবহার করা জামাকাপড় বাইরে ঝেড়ে তারপর আলমারিতে তুলুন। বন্ধ তাকের মধ্যে রাখা জিনিসপত্রগুলোর ওপরে ঢাকনা দিয়ে রাখুন। কার্পেট বা পাপোশ নিয়মিত ঝেড়ে পরিষ্কার করুন বাইরে নিয়ে বা ছাদে। অ-খেয়ালে ঘরে ঝাড়লেই ধুলো উড়ে তো পড়বে। সপ্তাহে একদিন পুরো ঘর ভ্যাকুমক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করুন। ঝুলও ঝাড়ুন। ভ্যাকুমক্লিনার না থাকলে নারকোল ঝাড়ু ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু এতে আবার ধুলো এসে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

সমস্যা ২৪

আয়না থেকে শুরু করে কম্পিউটারের স্ক্রিন, এল সিডি টিভি স্ক্রিনে হাতের বা জলের ছাপ পড়া। কিংবা ধুলো পড়া।

সমাধান

অনেক চেষ্টা করেও এগুলো এড়ানো যায় না। তাই আয়না বা কম্পিউটার স্ক্রিন পরিষ্কার রাখার জন্য বিশেষ নজর দিতেই হয়। শুকনো, নরম কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে স্ক্রিন মুছবেন। ভাল হয়, গেঞ্জি কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করলে। কোনও ডিভাইস পরিষ্কার করার আগে অবশ্যই এর সুইচ অফ করে নেবেন। যদি শুকনো কাপড়ে দাগ না ওঠে তাহলে সামান্য ভিনিগার দিয়ে মুছতে পারেন। কোনও গ্লাসক্লিনার ব্যবহার করলে সরাসরি যেন ডিভাইসে স্প্রে করবেন না। খবরের কাগজ ভিজিয়ে আয়না পরিষ্কার করলেও এই পদ্ধতি কখনও কম্পিউটার বা টিভিতে ব্যবহার করবেন না।

সমস্যা ২৫

জুতোর বিশ্রী গন্ধ ব্যবহারকারীকে তো বটেই পরিবারের অন্যদেরও বিব্রত করে তোলে।

সমাধান

অতিরিক্ত পা ঘেমে যাওয়া এর প্রধান কারণ। জুতো খুলে

খানিকক্ষণ হাওয়ায় রাখতে হবে। মোজা জুতোর মধ্যে গুঁজে রাখা উচিত নয়। পা ধোওয়ার সময় নুন-জল ব্যবহার করলে পা আর্দ্র থাকে। সমস্যাও কম হয়। সপ্তাহে না হলেও দু সপ্তাহে একদিন বালতির জলে খানিকটা ভিনিগার দিয়ে কিছুক্ষণ পা ডুবিয়ে রাখলে গন্ধ কম হয়। ভিনিগারের পরিবর্তে চা-ভেজানো জলও ব্যবহার করতে পারেন। পায়ে মোজা পরার আগে ডিওডারেন্ট স্প্রে করলে পা কম ঘামবে। গন্ধের সমস্যাও কম হবে। দিনে অন্তত একবার অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল সাবান দিয়ে পা ধুতে হবে। মোজা রোজকারটা রোজ ধোওয়া প্রয়োজন। জুতো মুছে হাওয়ায় খোলা অবস্থায় রাখবেন, তারপর বাক্সে তুলবেন।

সমস্যা ২৬

বাড়ির পোষ্যের জন্য শিশুর দুদিন অন্তর অ্যাজমা দেখা দেওয়া।

সমাধান

পোষা কুকুর, বেড়ালের রোম থেকে শিশুদের অ্যালার্জি, অ্যাজমা

খুব কমন সমস্যা। এর থেকে দূরে রাখার জন্য শিশুকে পোষ্য থেকে দূরে রাখুন। শিশুর ব্যবহার করা বিছানায় যেন কখনওই পোষ্য না ওঠে। কুকুর, বেড়ালদের নিয়মিত স্নান এবং ব্রাশ করানো দরকার। শিশু এবং পরিবারের প্রত্যেকে যেন পোষ্যটিকে আদর করার পর ভালভাবে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নেয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

সমস্যা ২৭

ছোট শিশুদের বোলতা, মৌমাছি বা মশা কামড়ানো।

সমাধান

বোলতা বা মৌমাছি কামড়ানোর পর যত দ্রুত সম্ভব হুলটা বের করে দিতে হবে। কামড়ানো জায়গাটাতে বরফ বা ঠাণ্ডা প্যাক চেপে ধরতে হবে যাতে ফুলে না ওঠে। সাবান ও জল দিয়ে জায়গাটা ধুয়ে বেকিং সোডা এবং জল মিশিয়ে লাগিয়ে দিলে যন্ত্রণা কমতে থাকে। মশা কামড়ালে জায়গাটা চুলকোলে সাময়িক আরাম হয়। তবে চুলকানো উচিত নয়। এতে সমস্যা বাড়তে পারে। চুলকানো বন্ধ করার জন্য লেবুর রস লাগাতে পারেন। অবশ্যই জলে গুলে। সরাসরি লেবুর রস কখনও না। জলে গুলে, তুলো দিয়ে লাগাতে পারেন, বা চন্দন বাটা কিংবা ক্যালামাইনও দিতে পারেন।

সমস্যা ২৮

ইনডাকশন কুকারটা কেনার পরেও বিদ্যুতের বিল বেশি আসার আশঙ্কায় পিছিয়ে যাওয়া।

সমাধান

একথা ঠিক, অনেকেই বলেন ইনডাকশন কুকটপে তেমন বিদ্যুতের বিল ওঠে না। যদিও ব্যবহারকারীদের এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। তবে অন্যের কথা না শুনে মিটার বক্স চেক করলেই বোঝা যাবে বেশি বিদ্যুৎ খরচ হয় কি না। ইনডাকশন কুকার ব্যবহার করবেন সতর্কতার সঙ্গে। কোনও গরম বাসন বসাবেন না। আভেন ক্লিনার দিয়ে এর কুকওয়্যার পরিষ্কার করবেন না। ভারী জিনিস এর ওপর বসিয়ে রাখবেন না। আর রান্না করার সময় কোনও কিছু উথলে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার অফ করে সেরামিক প্লেটটা মুছে নেবেন।

সমস্যা ২৯

দামি মার্বেল বসানো মেঝে অথচ দুদিনেই কেমন বিশ্রী দাগ ধরে যায়।

সমাধান

দামি মার্বেলের সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্য নিয়মিত পরিষ্কার করা দরকার। সাধারণ মেঝের মতো যেমন তেমনভাবে নয়, বিশেষ নজর দিতে হবে। জলে যেন পিএইচ ফ্যাক্টর ঠিক মতো বজায় থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঠাণ্ডা জলে ডিটারজেন্ট বা স্টোন সোপ লিকুইড মিশিয়ে সাধারণ মপ দিয়ে মুছতে হবে। বার বার জল পাল্টে মুছতে হবে। মেঝে প্রয়োজনে ফ্যান চালিয়ে পুরোপুরি শুকিয়ে নিয়ে তারপর হাঁটাচলা করবেন। ভিনিগার বা অ্যাসিড জাতীয় কোনও কিছু মার্বেল পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করা চলবে না।

সমস্যা ৩০

ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের ব্রাশগুলো ঠিকমতো কাজ না করা। ফলে ভ্যাকুয়ামিং-এর সময়ে সময়ের অপচয়, কাজে বিরক্তি ধরা।

সমাধান

পরিষ্কার করার সময় ব্রাশের মধ্যে সুতো, ময়লা বা অন্য কিছু জড়িয়ে গেলে এয়ার ফ্লো কমে যায়। তাই নিয়মিত ব্রাশ চেক করতে হবে, বিয়ারিং-এ তেল দিতে হবে। কোনও ভেজা জায়গায় ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করা যায় কি না তা ম্যানুয়াল পড়ে জেনে নিন। নয়তো আবার অন্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর চালানোর সময় যদি হঠাৎ করে কোনও শব্দ হয় সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অফ করে দিন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন।

শুধু তোমার ভ্যালেন্টাইনের জন্য

এখানে কিছু নোনতা-মিষ্টি খাবারের হদিশ দেওয়া হল যা তোমরা তোমাদের জীবনের সেই মানুষটিকে করে খাওয়াতে পার যাঁকে দেখলে দিনটা ঝলমলিয়ে ওঠে। রেসিপি জানিয়েছেন সুমিতা শুর

নানখাটাই বিস্কিট

কী কী লাগবে

সুজি : ১ কাপ ; ময়দা : ১/২ কাপ ; বনস্পতি : ১ কাপ ; পেষা চিনি : ১ কাপ ; পেষা ছোট এলাচ : ১ চিমটে ; বেকিং পাউডার : ১/২ চা চামচ।

কী করে করবেন

বেকিং পাউডার ও ময়দা মিশিয়ে চালুনি দিয়ে চালুন। বনস্পতি পেষা চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে ফেটিয়ে নিন। ময়দার মিশ্রণের সঙ্গে সুজি মেশাবেন। চিনি বনস্পতি দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। ছোট ছোট গোল লেচি করে বেলে উপরে এলাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে ১৮০° তাপমাত্রায় প্রিহিটেড আভেনে বেক করুন ৩০ মিনিট।

চেরি কেক

কী কী লাগবে

মাখন : ১ কাপ ; ক্যাস্টর সুগার : ১ কাপ ; ডিম : ৪ টি ; ময়দা : ৩ কাপ ; বেকিং পাউডার : ১/২ চামচ ; চেরি (ছোট করে কাটা) : ১ কাপ ; কাজু : ১/২ কাপ ; আমন্ড এসেন্স : কয়েক ফোঁটা ; দুধ : ১ টেবিল চামচ।

কী করে করবেন

মাখনে চিনি মিশিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। তাতে ডিম দিয়ে আরও একবার ফেটান। এই মিশ্রণে একে একে ময়দা, বেকিং পাউডার, চেরি, কাজু, আমন্ড এসেন্স, দুধ দিয়ে ভাল করে ফেটান। আভেনে ৩৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে ১ঘণ্টা বেক করুন। আর ফয়েল দিয়ে মুড়ে আরও আধঘণ্টা বেক করলেই তৈরি চেরি কেক। উপরে আইসিং দিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো সাজিয়ে দিতে পারেন। যদি চান তাহলে হার্ট শেপ-এর কৌটোয় দিয়ে বেক করতে পারেন। বেক করার আগে, বেকিং পাত্রে একটু মাখন লাগিয়ে নিলে কেকটা পাত্রে আটকে যায় না। কেকের উপর চেরি ও ক্রিম দিয়েও সাজাতে পারেন।

সুগার বিস্কিট

কী কী লাগবে

ময়দা : ১০০ গ্রাম ; বেকিং পাউডার : ১/২ চামচ ; নুন : ১ চিমটে ; কর্নফ্লাওয়ার : ২৫ গ্রাম ; মাখন : ২৫ গ্রাম ; মাখন : ১০০ গ্রাম ; ডিম : ১টি ; ভ্যানিলা এসেন্স : কয়েক ফোঁটা।

কী করে করবেন

ময়দা, বেকিং পাউডার, নুন, কর্নফ্লাওয়ার একসঙ্গে মিশিয়ে ঢেলে নিন। মাখন ও চিনি দিয়ে মেশান। ডিম ভাল করে ফেটিয়ে তাতে ভ্যানিলা এসেন্স দিন। ডিম, ময়দার মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে শক্ত করে মাখুন। বেলে নিয়ে গোল করে কেটে বেকিং ট্রেতে ১৮০° তাপমাত্রায় (প্রিহিটেড)১৫ মিনিট বেক করুন। ঠাণ্ডা হলে উপরে চিনির গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন।

ফ্যান্সি চকোলেট ক্রিম বিস্কিট

কী কী লাগবে

মাখন : ১ কাপ ; চিনি গুঁড়ো : ১১/২ কাপ ; ডিম : ২ টি ; ময়দা :

হানি কর্নফ্লেক্স চকোলেট

কী কী লাগবে

ডার্ক চকোলেট বার : ২০০ গ্রাম ; কর্নফ্লেক্স : ২ কাপ ; মেরি বিস্কুটের গুঁড়ো : প্রয়োজনমতো ; মধু : ৪ চামচ ; চিনিরগুঁড়ো : ২ বড় চামচ ; বাদামের গুঁড়ো : অল্প।

কী করে করবেন

কর্নফ্লেক্স মিক্সিতে গুঁড়িয়ে নিন মিহি করে। মেরি বিস্কুটের গুঁড়ো, মধু, চিনি মিশিয়ে একটা মন্ড তৈরি করুন। ফ্রিজে রাখুন ৩০ মিনিট। ছোট ছোট বল তৈরি করে গলানো চকোলেট মাখিয়ে উপরে চিনি, বাদামের গুঁড়ো মাখিয়ে নিন।

২ কাপ ; ভ্যানিলা এসেন্স : ৪/৫ ফোঁটা ; বেকিং পাউডার : ১ চামচ।

কী করে করবেন

ময়দা, চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ডিম ও এসেন্স মিশিয়ে ফেটাবেন। ময়দার মিশ্রণ ও বেকিং পাউডার একসঙ্গে মিশিয়ে ঢেলে নিন। একটি পাত্রে ময়দা ঢালুন, অল্প অল্প করে ফেটানো ডিম-মাখনের মিশ্রণ ঢেলে মেখে নিন। বেলে নিয়ে বিস্কুট কাটার দিয়ে কাটুন। ঘি মাখানো বেকিং ট্রেতে ১৮০° তাপমাত্রায় বাদামি করে বেক করুন। ঠাণ্ডা করুন। দুটি বিস্কুটের মধ্যে চকোলেট বাটার আইসিং লাগিয়ে মুড়ে দিন। বাটার আইসিং-এর জন্য চকোলেট, মাখন ও আইসিং সুগার একসঙ্গে গলিয়ে তৈরি করতে পারেন বা বাজার চলতি চকোলেট ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন।

স্ট্রবেরি কাপ কেক

কী কী লাগবে

স্ট্রবেরি : ১০০ গ্রাম ; চিনি গুঁড়ো : ১০০গ্রাম ; ডিম : ৩ টি ; ময়দা : ১০০ গ্রাম ; বেকিং পাউডার : ১ চা চামচ ; মাখন : ১০০ গ্রাম ; দুধ : $^{1}/_{2}$ কাপ ।

কী করে করবেন

একটি পাত্রে মাখন, চিনি, ডিম একসঙ্গে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। ময়দা ও বেকিং পাউডার ঢেলে নিয়ে ডিমের মিশ্রণে মেশান। মিশে গেলে অল্প রেখে বাকি স্ট্রবেরি কুচিয়ে দিন। দুধ মেশান। কাপের মোল্ডে ব্যাটার ঢেলে প্রি হিটেড আভেনে ২০০° ডিগ্রি তাপমাত্রায় ১৫ মিনিট বেক করুন। ঠাণ্ডা হলে ওপরে স্ট্রবেরি কুচি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

আমন্ড চকোলেট

কী কী লাগবে

আমন্ড বাদাম : ১০০ গ্রাম ; মিল্ক চকোলেট : ১০০ গ্রাম।

কী করে করবেন

আমন্ড ৩০ মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখুন। মিল্ক চকোলেটবার ১০০ শতাংশ পাওয়ার লেভেলে ২ মিনিট রেখে গলিয়ে নিন। চকোলেট মোল্ডে একটা করে আমন্ড রেখে উপরে গলানো চকোলেট ঢেলে ফ্রিজে জমতে দিন ১ ঘণ্টা।

সরস্বতী পুজো স্পেশাল

সরস্বতী পুজোর দিন যেমন স্কুলে স্কুলে বাড়িতে বাড়িতে পুজো হয়, তেমনই বিশেষ কিছু খাবারও রান্না হয় ওই দেবীকে উপলক্ষ্য করে। সুমিতা শুর সরস্বতী স্পেশাল কিছু খাবারের হদিশ দিলেন সুবিধার পাঠককুলের জন্য।

গোটা সেদ্ধ

কী কী লাগবে

পুঁই মিটুলি (বাজারে পাওয়া যায়) : ২৫০ গ্রাম ; গোটা কড়াইশুটি (খোসা সমেত) : ১ কাপ ; ছোট বেগুন গোটা : ৪/৫টা ; রাঙাআলু (গোটা) : ২টি ; ছোট নতুন আলু : ১০/১২ টা ; সিম গোটা : ৬/৭টা ; গোটা সবুজ মুগ : ২৫০ গ্রাম ; গোটা কাঁচালঙ্কা : ৬/৭ টি ; আদাবাটা : ২ চা চামচ ; নুন : স্বাদমতো।

কী করে করবেন

প্রথমে প্রেশারকুকারে সব সবজি ধুয়ে গোটা অবস্থায় দিন। সবুজ মুগ দিয়ে জল দিন, প্রেশারে ২টি সিটি দিয়ে নামিয়ে নুন, চিনি, আদাবাটা দিয়ে পরিবেশন করুন।

এদেশীরা যাঁদের চলতি কথায় ঘটি বলা হয়, তাঁরা এটি সরস্বতী পুজোর দিন করে রেখে পরের দিন বাসি অবস্থায় খান। কারণ ওই দিন কোনও গরম জিনিস খেতে নেই।

খই-এর পায়েস

কী কী লাগবে

খই : ২৫০ গ্রাম ; দুধ : ১ লিটার ; নতুন গুড় : ৫০০ গ্রাম ; কেশর-পেস্তা : সামান্য ; কাজু-কিশমিশ : সাজানোর জন্য।

কী করে করবেন

১লিটার দুধ গুড় দিয়ে ফুটিয়ে ১/২লিটার করুন। দুধ ঘন করার সময় খুব নেড়ে নেবেন ও অল্প আঁচে রাখবেন। এই ঘন দুধে, গরম অবস্থায় খই মেশান, পরিবেশনের সময় কেশর, পেস্তা, কাজু, কিশমিশ দিয়ে সাজিয়ে দিন।

ভোগের খিচুড়ি

কী কী লাগবে

ভাজা সোনা মুগডাল : ২৫০ গ্রাম ; তেজপাতা : ২/৩ টি ; গোবিন্দভোগ চাল : ২৫০ গ্রাম ; ঘি : ১০০ গ্রাম ; শুকনো লঙ্কা : ৩/৪ টি ; গোটা জিরে : ১চা চামচ ; আদাবাটা : ২ চা চামচ ; নুন : পরিমাণ মতো ; চিনি : স্বাদ মতো ; ফুলকপির ফুল : ১০/১২ টা ; মটরশুঁটি ছাড়ানো : ১ কাপ ; গাজর ডুমো করে কাটা : ১ কাপ ; আলু ডুমো করে কাটা : ১ কাপ ; গরম মশলা গুঁড়ো : ১/২ চা চামচ।

কী করে করবেন

হাঁড়িতে ঘি গরম করে সোনামুগ ডাল ভেজে নিন। ফুলকপি, আলু, মটরশুঁটি দিয়ে অল্প ভেজে তুলে নিন। আরেকটু ঘি দিয়ে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরে ফোড়ন দিন। এর মধ্যে ভাজা সবজি ও ডালের মিশ্রণ দিন। গোবিন্দ ভোগ চাল ধুয়ে দিন।

আদাবাটা দিয়ে অল্প নাড়াচাড়া করে অল্প গরম জল দিয়ে ঢাকা দিন। ফুটে উঠলে আঁচ কমিয়ে দিন। ঢাকা দিন। সব সেদ্ধ হলে ও ঘন হলে ওপর থেকে ঘি, গরম মশলাগুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

ছানা ইঁচড়ের কিমা

কী কী লাগবে

ইঁচোড় : ৫০০ গ্রাম ; ছানা : ১০০ গ্রাম ; তেজপাতা : ২টি ; ছোট এলাচ : ৪টি ; সাদা জিরে : সামান্য।

গ্রেভির জন্য : বড় এলাচ : ২টি ; দারচিনি : ১ টুকরো ; লবঙ্গ : ৪টি ; নারকোল : ১/২ মালা ; জায়ফল : ১/৪ ভাগ ; আদা : ১ ইঞ্চি টুকরো ; হলুদ : পরিমাণমতো ; পোস্ত : ১/২ চামচ ; টকদই : ১/২ কাপ ; তেল : পরিমাণ মতো (সরষের) ; ঘি : ২ চামচ ; চিনি : স্বাদমতো।

কী করে করবেন

ইঁচোড়ের খোসা ছাড়িয়ে কিমার মতো মিহি করে কুচিয়ে রাখুন। তারপর অল্প তেল, হলুদ দিয়ে ভাপিয়ে জল ঝরিয়ে নিন। ছানা হাল্কাভাবে ভেঙে নিন। দই বাদ দিয়ে অন্য মশলা ও আদা, পোস্ত, নারকোল বেটে নিন। কড়াতে তেল ও ঘি দিয়ে ছোট এলাচ, তেজপাতা জিরে ফোড়ন দিয়ে ইঁচোড় দিন। হাল্কা নেড়ে চেড়ে ইঁচোড় তুলে নিন। আবার ৪-৫ চামচ তেল দিয়ে দই দিন। নুন, চিনি দিয়ে কষে নিন, হলুদ দিন, বাটা মশলাও কষে নিন।

কুলের টক

কী কী লাগবে

টোপা কুল : ৫০০ গ্রাম ; গুড় : ২৫ গ্রাম ; গোটা সরষে : ১ চা চামচ ; সরষের তেল : ৪ চা চামচ ; নুন : স্বাদমতো ; তেঁতুলের ক্বাথ : ১ চা চামচ।

কী করে করবেন

কড়াতে সরষের তেল গরম করে তাতে গোটা সরষে ফোড়ন দিন। তেলে টোপা কুল অল্প নাড়াচাড়া করে জল দিন। সঙ্গে গুড় দিন। ভাল করে সেদ্ধ হলে ও গুড় মিশে গেলে নুন ও তেঁতুলের ক্বাথ দিয়ে নামিয়ে দিন।

ভাজা এঁচোড় দিয়ে কষিয়ে জল দিন। সেদ্ধ হলে নামাবার আগে ছানা মিশিয়ে দিন। ঘন হলে নামান।

মুখি কচু দিয়ে ইলিশের ঝোল

কী কী লাগবে

ইলিশ মাছ : ৬ টুকরো ; মুখি কচু : ২৫০ গ্রাম ; জিরে গুঁড়ো : ১০ গ্রাম ; হলুদগুঁড়ো : ৫ গ্রাম ; কালোজিরে : ২ গ্রাম ; কাঁচালঙ্কা : ৬টি ; সরষের তেল : ৫০ গ্রাম ; নুন : স্বাদমতো।

কী করে করবেন

মুখি কচুগুলো দুই ফালি করে কেটে ধুয়ে রাখুন। ইলিশের টুকরোগুলো ধুয়ে নুন, হলুদ মাখিয়ে রাখুন। কড়াতে তেল দিন। তেল গরম হলে কালো জিরে, কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিন। তেল গরম হলে কালো জিরে, কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিন। মুখি কচুগুলো ছাড়ুন। হলুদ, জিরেগুঁড়ো দিন। একটু নেড়ে জল ঢেলে মাছগুলো ছাড়ুন। কচু ও মাছ সেদ্ধ হলে পরিমাণমতো নুন দিন। ফুটে গেলে নামিয়ে পরিবেশন করান। বাঙাল বাড়ি অর্থাৎ যাঁরা ওপার বাংলার মানুষ, তাঁরা সরস্বতী পুজোয় ইলিশ মাছ খেয়ে থাকেন।

মানসচারিনী

অনুপ ঘোষাল

মেয়েটি ভারি আশ্চর্যের। তাকে আমি চোখে দেখিনি। শুধু কথা শুনেছি, তাও মনের ভিতর। সে আমার পাঁজরের মধ্যে থেকে কী-সব বলে চলে যেন! ফিসফিসিয়ে নয়, স্পষ্ট উচ্চারণে। ভারি সুরেলা তার গলার স্বর।

তাকে দেখিনি, অথচ কেমন দেখতে—সেটা জানি। দেখিনি মানে, চোখের বাইরে নজরে পড়েনি আর কি! কিন্তু মনের ভিতর সে তো অহরহ আসে-যায়, জানব না সে দেখতে কেমন? এক কথায় ফাটাফাটি! অসাধারণ।

একটা স্রেফ লালপেড়ে শাড়ি পরে খোলা চুলেই যদি দাঁড়িয়ে থাকে, বিনা প্রসাধনেও সে অপরূপা। অনন্যা। ফরসা নয় ঠিক, অথচ কালোও বলা যাবে না মোটে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বলে বাংলায় একটা কথা আছে না, হয়তো তেমনটাই ; কিন্তু ভারি চকচকে তার ত্বক। শুধুই মুখখানার নয়, ঘাড়ের গলার হাতের গোটা শরীরটাই। কাচের মতো স্বচ্ছ, মোমের মতো মসৃণ ; এক ফোঁটা ঘাম জমলেও গড়িয়ে পড়ে। যে দুটো বৈশিষ্ট্যের জন্য সে আমার চোখে অনন্যা, তার প্রথমটা হল—মেয়েটির লম্বা কালো এক মাথা ঘন চুল। এক মাথা না বলে আজকালকার মেয়েদের তুলনায় পাঁচ মাথা বলা সঙ্গত। যখন খোঁপা বাঁধা থাকে আন্দাজ করা যায় না হয়তো। কেন না, চুলের গোছা গোটানো থাকে মাথার পিছন দিকে, কিন্তু খোলা থাকলে আষাঢ়ের মেঘের মতো তার চুলের রাশি দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আর একটা দেখার মতো ব্যাপার, ওর হাসি। লালচে-বাদামি পাতলা ঠোঁটের ফ্রেমে ওর মুক্তোদানার মতো সাজানো দাঁতের সারি যখন ঝিলিক দেয়, মুখখানা এত মিষ্টি লাগে বলার নয়। ওই দুটো দেখার জিনিস ছাড়াও ওর টিকল নাকের দুই পাশে কুয়োর মতো গভীরকালো চোখ-জোড়া, আহ্! সে তো শুধু দেখার নয়, অনুভবেরও। এমন করে সেই মেয়ে তার পুরো মনটা দু'চোখের কালো তারার ওপর এনে তাকাতে পারে, একেবারে সম্মোহিত হয়ে যাই। নড়বার-চড়বার আর সাধ্য থাকে না, বাক বন্ধ। শুধু মনে হয়, এই মেয়ের জন্যে যদি আমি মরে যেতে পারি— সে আমার ভাগ্য।

কিন্তু মরব কী করে? মেয়েটি আমার মৃতসঞ্জীবনী সুধা। তার জন্যেই তো আমার বেঁচে থাকা। কবে সে হৃদয়ের ভিতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াবে! বলবে এস হাত ধর।

সেই অপেক্ষাতে আছি। থাকব।

মেয়েটি আমাকে আগলে রাখে। আমার যা কিছু সৃষ্টি—এই লেখালেখি, আঁকাআঁকি, সঙ্গীতের সুর ও বানী—সমস্ত কিছু তার জন্যেই। সেই মেয়েই ভিতর থেকে আমাকে উসকে দিয়ে চলেছে। নিরন্তর। সবকিছুর প্রেরণা সে-ই। সেই মেয়ের জন্যেই আমার যা কিছু 'মহত্ত্ব'। মহৎ তো আসলে আমি নই, জানি। আমি হিসেবি, কখনও স্বার্থপর, কদাচিৎ অসৎ-ও। কিন্তু যে কোনও অন্যায় নীচতা বা অসততায়, আমি প্ররোচিত হলেই রানি আমার বুকের মধ্যে থেকে ডাক দিয়ে সাবধান করে— না, এটা হয় না। এমন তুমি করতে পার না। আমার প্রেম যখন পেয়েছ, তুমি ঈশ্বরের মতো সুন্দর, পবিত্র। কোনও কলুষতা তোমাকে মানায় না। কথাগুলো বলে সে ডাগর চোখে চেয়ে থাকে অপলক। কড়া নজরদারি।

নিজেকে তখন সামলে নিই। নিতে পারি। ফিরে দাঁড়াই। রানির হুকুম অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই।

হ্যাঁ, তার নাম রানি। সেই আমাকে লেখায়, আঁকায়। গান বাঁধায়, সঠিক সুরটা ধরিয়ে দেয়। ভিতর থেকে আমার গল্পে নভেলে বারবার সে নায়িকা হিসেবে হাজির হয়। রানি আমার রানি। কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে, এখনও তারে চোখে দেখিনি। শুধু বাঁশি শুনেছি, মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।

রানি আমাকে ভিতর থেকে পরিচালনা করে। সব সময় যখন বৃদ্ধা ভিখারিনীকে কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দিই, সে ধমকে ওঠে—অ্যাই কী হচ্ছে! দুই বা পাঁচ টাকার কয়েন তুললে মুঠো চেপে ধরে আমার, দশ-বিশ টাকার নোট বের করতেই হয়। কৃপণতাকে তুলে রাখতে হয় শিকেয়। অন্ধ হাতড়ে হাতড়ে রাস্তা পেরোচ্ছে, আমি তাড়াহুড়োয় এড়িয়ে চলে গেলে রানি আমাকে

ডেকে ফিরিয়ে আনে। বলে —পালাচ্ছ কেন? যাও, গিয়ে হাত ধর। যেখানে যেতে চায়, পৌঁছে দাও। একটু দেরি হয়ে যাবে তো তোমার? হোক! আমি ওর হুকুম তামিল করে খুশি হই। রাস্তায় রিকশায় চাপা পড়া কুকুরছানা কুঁই কুঁই করে কাঁদছিল। সামনের একটা পা চাকায় পিষে গেছে। আমি আর কী করব, মরে তো যাবেই। সকলের মতো আমিও মুখে একটু সহানুভূতি জানিয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলাম ও আমাকে দাঁড় করালো। বাচ্চাটাকে ভেটেরেনারি সার্জেনের কাছে নিয়ে যেতে হল। অ্যামপ্যুট করে থেঁতলানো পা-টা বাদ দিতে হয়েছিল। তবে ইনেঞ্জকশন আর ওষুধের জোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল কুকুরের ছানাটা। লালু এখন তিন পায়েই আমাদের বাড়ির বিস্বস্ত পাহারাদার। রানি এই ভাবেই প্রতিনিয়ত আমাকে চালনা করে, শক্তি জোগায়। ওর উপযুক্ত হয়ে উঠতে প্রাণিত করে।

২

সেদিন কলকাতা থেকে রামপুরহাট যাচ্ছিলাম। সকাল ছটা দশে হাওড়া থেকে গণদেবতা এক্সপ্রেস ছাড়ল। একটা স্কুলের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠেয় রজত জয়ন্তী উৎসবে আমি প্রধান অতিথি। সম্প্রতি লেখালেখির জগতে একটু পরিচিতি বাড়ার কারণে এমন আবদার মাঝেসাঝে রাখতেই হচ্ছে। দশটা নাগাদ সেখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে স্টেশনে কেউ আসবেন। স্কুলটা কাছেই। দুপুর বারোটা নাগাদ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা। তার আগে হোটেলে স্নানটান সেরে জামাকাপড় বদলে তৈরি হয়ে নেওয়া যাবে। ওঁরা সস্ত্রীক যাওয়ার জন্যেই বলেছিলেন। একা জেনে বিস্মিত এবং খুশিও সম্ভবত। ত্রিশোর্ধ্ব নামি লেখক অথচ জীবনসঙ্গীনি জোটেনি?

শনিবারের সকাল। হাওড়া থেকেই গাড়িতে বেশ ভিড়। অনেকেই অবশ্য বর্ধমানে নেমে যাবেন। বেশ কিছু যাত্রীর গন্তব্য শান্তিনিকেতন। তারপর বকেয়া তারাপীঠের কয়েকজন পুণ্যার্থীকে নিয়ে রামপুরহাট। গাড়ি তখন গড়ের মাঠ।

আমার কাছাকাছি বয়েসের কয়েকজন চলেছে প্রান্তিক। বোলপুরের পরের স্টেশন। নতুন ট্যুরিস্ট স্পট। কাছেই কোপাই নদী। বাহান্নপীঠের অন্যতম কংকালিতলা প্রান্তিক থেকে মাত্র তিন মাইল। বিশ্বভারতী আর ডিয়ার পার্ক তো পাশেই। প্রান্তিক দ্রুত উন্নয়নের পথে। ভ্রমণার্থীদের নতুন পছন্দ।

চারজন সহযাত্রীর দলটিতে যাকে বাচ্চু বলে বাকিরা ডাকছিল, তাদের কথাবার্তা থেকে প্রকাশ পেল, সেই যুবকের বাবা প্রান্তিক স্টেশনের গায়েই সম্প্রতি একটা বাগানবাড়ি বানিয়েছেন। কেয়ারটেকার আছে। স্টেশন থেকেই কাছাকাছি তেমন অনেকগুলো বাংলো চোখে পড়ে। তিন বন্ধুকে নিয়ে বাচ্চু চলেছে সেখানে। সপ্তাহান্তে একটু ফূর্তিফার্তার জন্যে। ওদের কথোপকথনের মধ্যেই সকলের নাম জানা গেল। তপন একটু নেতাগোছের আমার থেকে বড়-ই মনে হচ্ছে বয়সে। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কম নয়। বাচ্চু সহ বাকি দুজন তাকে দাদা বলেই ডাকছিল। পিন্টুর বয়স মনে হল ত্রিশের নিচেই। বাকি দুজন আমার সমবয়েসি বলেই বোধ হচ্ছে। সামনের লম্বা সিটটায় আমার মুখোমুখি বসেছিল ওদের মধ্যে তিনজন। নিলয় নামের তরুণটি ঠিক আমার ডানপাশে। কাছাকাছিই সকলে আছি অথচ কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না। হতেই পারে । সহযাত্রীটিকে বোধকরি দলের মধ্যে কারুরই পছন্দ হয়নি। সকলেরই একটা উন্নাসিক ভাব।

তাদের আলোচ্য বিষয়—কীভাবে সেখানে দুটোদিন জমিয়ে মজাটজা করা হবে। নিচু গলায় আলোচনা ও শলা-পরামর্শ চলছে। পরস্পরের কাছে খতিয়ে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে, নেশার বিচিত্র সব সামগ্রী ঠিকঠাক আনা হয়েছে কি না! ওদের কথাবার্তায় প্রকাশিত তাদের তপনদা পর্যন্ত এখনও বিয়েথা করেনি। বাচ্চু এমনকী পিন্টুরও গার্লফ্রেন্ড আছে। জানা গেল, বিবাহিত শুধু আমার পাশে বসে থাকা নিলয়। সে বারবার যাত্রাপথের বিবরণ দিয়ে সেলফোনে বউ-এর সঙ্গে কথা বলছে। এই আদিখ্যেতা সঙ্গীদের সহ্য হচ্ছে না। একটু রোম্যান্টিক সংলাপ চালাচালির ইঙ্গিত থাকলেই বাকি ক জনের কাছ থেকে ঠাট্টাও বেচারাকে হজম করতে হচ্ছে বিস্তর। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই তার। বাড়িতে একবার ফোন লাগালে ছাড়ার নাম নেই। তপন গার্জেনগিরি করে ফোড়ন কাটল, গিট-বাঁধা বোকাদের এই জন্যে সঙ্গে নিতে নেই।

বোঝা গেল—পেশায় ওরা সকলেই ঘরবাড়ি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মালপত্রের সাপ্লায়ার। পিন্টু এক রাজনীতির রাঘববোয়ালের ভাগ্নে। স্থানীয় তিন মস্তানকে সঙ্গে নিয়ে সে মামার দলের ছত্রছায়ায় রাজারহাটে বিলডিং মেটিরিয়াল সাপ্লাই-এর একটা সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে। এলাকাটায় এখন প্রচুর কস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। কনট্রাকটারদের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। ফলে তাদের ইঁটবালি আর স্টোনচিপস-এর রমরম কেনাবেচা। পকেট গরম।

ওরা কজন নিজেদের মধ্যে আড্ডায় হইহুল্লোড়ে এমনই মশগুল, আমি এবং আমার বাঁদিকে জানলার পাশের সিটের এক বৃদ্ধকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনছে না। তপন আর বাচ্চু তো বেআইনি জেনেও সিগারেট ফুঁকে নিল কয়েকবার। নিজেদের মধ্যে রুচিহীন রসিকতায় বুঁদ।

ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে ট্রেন পৌঁছে গেল বর্ধমান স্টেশনে। একটু খালি হল কামরা। নিলয় সামনে উঠে গিয়ে ফাঁকা চতুর্থ সিট দখল করল। আমার পাশের বয়স্ক ভদ্রলোকও নেমে গেছেন। আমি বাঁদিকে সরে গিয়ে বসলাম জানলার পাশে। ট্রেন ছাড়তেই পশ্চিমের ফিনফিনে বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল।

বর্ধমান থেকে উঠে আমার ডানপাশে সিটটার দখল নিলেন বেশ চেয়ে দেখবার মতো এক মহিলা। আমার বয়সিই মনে হচ্ছে। ত্রিশ-বত্রিশের কম নয়। চোখের কোনে লক্ষ্য করছিলাম। সত্যিই দেখতে সুন্দর। অভিজাত সাজপাশাক। ছিমছাম করে বাঁধা একরাশ চুল। সোনালি ফ্রেমের চশমা। তার নিচে উজ্জ্বল দুই চোখ। ফুটফুটে ফরসা না হয়েও কোনও মেয়ে রূপসী হিসেবে অন্যের নজর টেনে রাখতে পারে, এঁকে দেখলে বিশ্বাস হয়। পরনে হালকা নীল-ডুরে তাঁতের শাড়ি। ঘন নীল পাড়ের আকাশি ব্লাউজ। মোটা লম্বা বিনুনিটা পিঠ থেকে কোমর ছুঁয়েছে। সব মিলে বেশ আকর্ষনীয় চেহারা।

কিছুক্ষণের মধ্যে খানিক সাহস সঞ্চয়ের পর ঘাড় ঘুরিয়ে খুঁটিয়ে আপাদমস্তক লক্ষ্য করতে থাকলাম। লেখক মানুষ, সুন্দরীর অনুপুঙ্খ বিবরণ প্রায়ই কলমে ফুটিয়ে তুলতে হয়। এই ভদ্রমহিলার সিঁথিতে সিঁদুর নেই, হাতে শাঁখা পলাও চোখে পড়ছে না। দুহাতে স্রেফ দুটো সোনার বালা। কানে নীলচে আভাযুক্ত মুক্তোর দুল। অবিবাহিতা, নাকি বিধবা কিংবা ডিভোর্সি—বোঝার উপায় নেই। বিবাহিতা হওয়াও অসম্ভব নয়। কপালে একটা ছোট্ট নীল টিপ। সন্ধ্যার আকাশে প্রথম ফোঁটা সাঁঝতারাটির মতো।

সুরূপা আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, একটু ওদিকে চেপে বসবেন ভাই?

ভাই! আমাকে দেখে ওঁর চেয়ে বয়সে ছোট মনে হয় নাকি? খুশি হয়ে বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ। নিন, ভাল করে বসুন। জানলার দিকে

আরও একটু সরে গেলাম।

ভদ্রমহিলা ভ্রূ কুঁচকে সামনের অমার্জিত সহযাত্রীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে আমি জিগ্যেস করলাম, কদ্দুর যাবেন?

উনি গলাটা বেশ নামিয়ে বললেন, শান্তিনিকেতন।

তবুও তপন নামের নেতাগোছের তরুণটি শুনতে পেয়ে গায়ে পড়ে বলল, আমরাও তো শান্তিনিকেতন।

ভদ্রমহিলা ওদের প্রতি কোনও আগ্রহ না দেখিয়ে আমার দিকে চোখ ঘোরালেন, আপনি?

—আরও একটু দূরে। রামপুরহাট। কৌতূহলবশে ওঁকে আবার জিগ্যেস করে ফেললাম, আপনি কি বেড়াতে?

—এই একা একা? না। আমার বোন ওখানে বিদ্যাভবনে পড়াশোনা করে। বাংলা ডিপার্টমেন্ট। মাস্টার্স-এর পর এম ফিল-এর ছাত্রী

আর আপনি, কী করেন?

ছাত্রী তো নই। শিক্ষক। বর্ধমানেই। ইংরেজি পড়াই।

স্কুলে?

না ইউনিভার্সিটিতে। আগে বর্ধমান রাজ কলেজে ছিলাম। আপনি? থতমত খেয়ে বললাম, তেমন কিছু নয়। এই লেখালেখি নিয়ে থাকি।

মানে! সাহিত্যিক?

জানি না। চেষ্টা করছি।

নামটা জানতে পারি?

অবশ্যই। পরে বলছি। তার আগে আপনার নামটা শুনতে চাই।

বানী সেন। আপনার নাম?

আমি অনুত্তম।

ও, অনুত্তম ঘোষাল?

ঠিক। নামটা আপনার শোনা ছিল তাহলে।

নিশ্চয়। গল্প লেখেন তো! পড়েছি। টিভিতে কী যেন একটা টেলিফিল্ম দেখলাম সেদিন... হ্যাঁ, আপনারই লেখা। দারুণ!

হ্যাঁ। দিনান্তে। সৌমিত্র আর সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

ঠিক ঠিক। খুব টাচিংস্টোরিটা। হঠাৎ সামনে বসে থাকা পিন্টু নামের ছেলেটি চোখ নাচিয়ে নিচু গলায় বলল, তপনদা, ওদিকে বেশ জমে গেছে— না? ইঙ্গিতটা সম্ভবত আমাদের দিকেই।

কথাটা বানী দেবীর কানে গিয়েছিল কিনা বুঝলাম না, তিনি আমার সঙ্গে গল্প করতেই থাকলেন।

তার মানে, আপনি চাকরিবাকরিতে নেই। মিসেস কী করেন?

হাসলাম, মাথা নেই তার মাথাব্যথা? অনিশ্চিত রোজগার। কোনও মেয়ের দায়িত্ব নিতে সাহস পাচ্ছি না। আপনার হাজব্যান্ড?

আমারও বিয়েথা হয়নি। করে ওঠা হয়নি আর কি! হবেও না।

সে কী! কেন? অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম।

আমি যখন ইউজিসি-র ফেলোশিপ নিয়ে বিশ্বভারতীতে রিসার্চ করছি, তখন আমার বাবা আর মা প্লেন-ক্র্যাশে একসঙ্গে মারা যান। সেই যে কানাডা থেকে আসবার সময় বোয়িং-টা একদম আটলান্টিকের ওপর...

ইস! তারপর?

তারপর আমি কোনওরকমে পিএইচডি-টা কমপ্লিট করে কলেজে ঢুকে পড়ি। একমাত্র বোন তখন সবে ক্লাস নাইন। মাধ্যমিক হায়ার-সেকেন্ডারির পর থেকেই বিশ্বভারতীতে। কবিতাটবিতাও লেখে।

তাই? বাহ্! উৎসাহিত হয়ে শুধোই, নাম কী?

শুনে কী করবেন? কোনও পত্রিকায় পাঠায় না। খুব লাজুক। ডায়েরিতে লেখে আর জমিয়ে রাখে। বোনের লেখালেখির একমাত্র পাঠিকা আমি। দিদি বলে বলছি না, সত্যিই ভাল লেখে কিন্তু। ছন্দটা তো গুলে খেয়েছে, কলমটাই অন্যরকমের।

আপনার যখন ভাল লেগেছে, নিশ্চয় কাগজে বেরোতে পারে।

পারে, অবশ্যই পারে। আপনি যদি সাহায্য করতে চান, ঠিকানা পেলে ওর কিছু লেখা আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারি।

ঠিকানা বললে মনে থাকবে? বরং মোবাইল নম্বরটা আমার রেখে দিতে পারেন। পরে যোগাযোগ করে কটা কবিতা পাঠিয়ে দেবেন। পড়ে দেখব।

ভদ্রমহিলা আমার নম্বরটা ওঁর সেলফোনে সেভ করে নিয়ে একটা কল করে দিলেন তখনই। পকেটে আমার হ্যান্ডসেটটা বেজে উঠতেই উনি কলটা কেটে দিয়ে বললেন, আমার নম্বরটাও আপনার মোবাইলে থেকে গেল। আপনি কী নিয়ে লেখাপড়া করেছেন, নিশ্চয় বোনের সাবজেক্ট?

নাহ্। আমি কেমিস্ট্রিতে অনার্স করেছিলাম।

কেমিস্ট্রি থেকে সাহিত্য? পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করেননি?

না না। নিতান্ত সাধারণ ছাত্র ছিলাম। অনার্স রাখতেই হিমসিম। নম্বর ফিফটি পার্সেন্টেরও নিচে। এম এস সি-তে চান্সই পাইনি!

তবুও স্কুলে তো একটা মাস্টারি পেতেই পারতেন।

পেয়েওছিলাম। আটদশ বছর আগে এস এস সি-র পরীক্ষায় বসে পড়েছিলাম খেয়ালের বশে ইন্টারভিউতেও উৎরে গেলাম। বোধহয় তখন আমার সাবজেক্টটার একটা বাড়তি চাহিদা ছিল। প্যানেলে নাম বেরোল, কিন্তু নিচের দিকে। পোস্টিং পেলাম কলকাতা থেকে অনেক দূরে। গেলাম না। একটা পাগলামি তো ছিলই। লেখালেখিতে তখন সবে একটা পরিচিতি পেতে শুরু করেছি। গোটা দশেক গল্প বেরিয়েছে নামি কাগজেই। একটা শারদীয়া সংখ্যাতে ছোট উপন্যাস প্রকাশ পেয়ে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে উৎসাহে টগবগ করে ফুটছি। খেয়ালের বশে চাকরিটাকে অগ্রাহ্য করার ঝুঁকি নিয়ে ফেললাম। এবং শেষ পর্যন্ত এই লেখালেখি নিয়েই থেকে গেলাম।

খুব বিশ্বাস আপনার নিজের ওপর। বানী সেন হাসলেন।

মা কর্পোরেশনের এক প্রাইমারি স্কুলের টিচার। বাবা নেই। মানিকতলার কাছে বিডন স্ট্রিটে একটা শরিকি বাড়ি আছে। বেশ পুরনো। নিচের তলায় এক ব্যাংকের অফিস। ভাড়ার টাকাটা খুব কম নয়। সব মিলে চলে যায় আর কি! আমার খামখেয়ালির মাশুল দিতে মাকে হিমসিম খেতে হয় না। ওঁর আরও কবছর চাকরি আছে, তার মধ্যে নিশ্চয় আমি ...

পারবেন। আপনি নিশ্চয় পারবেন। আপনার লেখা আমি পড়েছি। বয়েস কম হওয়া সত্ত্বেও একটা জায়গা সাহিত্যিক হিসেবে তো পেয়েই গেছেন।

জানি না। ঠিক জানি না। বিড় বিড় করতে থাকি আমি।

আমাদের আড্ডা থমকে গেল সামনের সিটে মুখোমুখি বসে থাকা বাচ্চু নামে ছেলেটা হঠাৎ বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গিতে বলে উঠল, তপনদা দ্যাখ জমে একেবারে ক্ষীর।

সকলে সমস্বরে হেসে উঠতেই হঠাৎ মাথাটা আমার গরম হয়ে উঠল। সামলে নিচ্ছি কোনওরকমে। এবার ভদ্রমহিলা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন। তবুও অপ্রস্তুত হলেন না। বিরক্তিটা শুধু

চেপে রাখার চেষ্টা করছেন। জবাব দেওয়ার উপায় তো নেই। আমিও প্রতিবাদের রাস্তা খুঁজে পচ্ছি না। এমন পরিস্থিতিতে কী-ই বা করার থাকে! ওরা সরাসরি কিছু বলেনি। দলে আছে চারজন। একটা ঝামেলা বাধলে একসঙ্গে রুখে উঠবে। চেপে যাওয়া ছাড়া কী উপায়।

গুসকরা স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে দিল। পিচকুড়ির ঢাল আর ভেদিয়া স্টেশনে গণদেবতা-র স্টপেজ নেই। অজয় নদের ওপরে লম্বা ব্রিজটা পেরোতেই বানী সেন উঠে দাঁড়ালেন। আলতো হেসে বললেন, উঠলাম ভাই। এরপর নামতে হবে। বোলপুর।

আমিও হালকা হাসি ফিরিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বললাম, আবার দেখা হবে। যোগাযোগ রাখবেন।

অনেকেই উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। বোলপুরে ট্রেনটা প্রায় ফাঁকা হয়ে যাবে। আমি অন্য কোথাও বসব বলে জানলার হাওয়া ছেড়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ওই মুখগুলো আর যেন দেখতে না হয়!

একটু এগিয়ে যাওয়ার পরেই পিছনে ওই মহিলার আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলাম। ভয়ানক কান্ড।

তপন নামের নেতাটি বানীর হাত ধরে কী যেন বলার চেষ্টা করছে। হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু কোনও সহযাত্রী ওঁকে সাহায্য করতে আসছেন না। কী আশ্চর্য।

কাছে এগিয়ে গেলাম। তপন বানীর কবজি সজোরে চেপে ধরে বলছে, এই তো পরের স্টেশন। পাঁচ মিনিট। প্রান্তিকে নামলে কী হয়? ওটাও তো শান্তিনিকেতন বিকেলেই ছেড়ে দেব। মালফাল সব আছে। স্রেফ একটু মস্তি। আরে ম্যাডাম, চল চল।

বাকি তিন সঙ্গী খ্যা-খ্যা করে হাসছে। আসপাশের যাত্রীরা নীরব দর্শক। অনেকেই গোলমাল দেখে অন্য দরজার দিকে পালাচ্ছে।

প্রচন্ড রাগ হওয়া সত্ত্বেও আমি তখনও চেপে আছি। হঠকারী মোটেই নই, হিসেবী মানুষ। সামান্য আলাপ হওয়া সত্ত্বেও মহিলার ওপর আমার কী দায় আছে? একটা অনুষ্ঠানে যাচ্ছি। সেখানে সকলে অপেক্ষা করছে। এখানে একটা ঝামেলার মধ্যে খামোকা জড়িয়ে পড়াটা কি সঙ্গত হবে? স্কুলটায় একটা উৎসব, আমি সেখানে প্রধান অতিথি। ঠিক সময়ে পৌঁছতে না পারলে? নটা তো বেজে গেল।

আবার দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। বুকের মধ্যে থেকে রানি বলে উঠল, এটা কী করছ? আমার দিদিকে লুম্পেনগুলো হেনস্থা করছে, আর তুমি পালাচ্ছ? ছিঃ!

আপনমনে বিড়বিড় করছি, আর যে কেউ কিছু বলছে না।

না বলুক। তুমিও কি সকলের মতো হয়ে গেলে? আমি যখন তোমার মধ্যে আছি, তুমি সবার থেকে আলাদা— মনে রেখ। যাও এগিয়ে যাও। দিদিকে বাঁচাও।

রানির কথায় আমি জেগে উঠলাম। হিসেব উঠল মাথায়, ভয়ডর চুলোয় গেল। ভদ্রমহিলার এমন বিপদ দেখে মাথার রক্ত আমার গরম হয়ে উঠল। বানী সেন তখন নিজেকে রক্ষা করবার জন্য দরজার দিকে চলে যেতে চাইছেন। পিন্টু নামের ছেলেটা আর একটা হাত ধরে টেনে রেখেছে। বাচ্চু দুজনকে উৎসাহ দিচ্ছে। নিলয় কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। ট্রেনের গতি অনেকটা কমে এসেছে। আউটার সিগন্যাল পেরিয়ে এলাম। দিনের আলোয় বোলপুর স্টেশনের কাছে এ কী কান্ড!

আমি রানির তাগিদে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছি ততক্ষণে। আর সহ্য করতে পারলাম না। পায়ে পায়ে এগিয়ে সোজা তপনের মুখে একটা পেল্লাই ঘুষি চাপিয়ে দিলাম। ও চিত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনও রকমে টাল সামলে নিয়েছে। তবু ভদ্রমহিলার হাতটা ছাড়েনি। উনি তখনও দরজার দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। গুণ্ডাটা হাতটা হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে ওঁকে কিছুটা এগোতে দিল, তারপর ট্রেনের দরজার সামনে পৌঁছতেই বাইরের দিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। আমার ওপর রাগটা উগরে দিল ওই নিরীহ মহিলার ওপর।

যাত্রীরা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। কে একজন মাথার ওপর ঝুলতে থাকা চেন টেনে ধরেছে। ইঞ্জিন থেকে হুইসেল দিচ্ছে। ইমার্জেন্সি ব্রেক কষা হয়েছে। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার আগেই থেমে গেল।

তখন এই বান্দার ওপর চলছে চার দুষ্কৃতির অজস্র কিল চড় লাথির বৃষ্টি। যাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে চেঁচামেচি শুরু করেছে, কিন্তু সাহস করে গুণ্ডাগুলোকে বাধা দিতে আসছে না কেউ। আমি দুই হাতে মাথাটুকু বাঁচিয়ে মার খেয়েই চলেছি। শেষ পর্যন্ত আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে গড়িয়ে পড়লাম কম্পার্টমেন্টের মেঝেয়। তারপর কিছু মনে নেই।

৩

দুপুর বেলাতেই জ্ঞান ফিরেছিল বিশ্বভারতীর পিয়ারসন মেমোরিয়াল হসপিটালে। চোখ খুলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, উনি কেমন আছেন?

সামনে দাঁড়ানো নার্স অবাক, উনি মানে?

সেই ভদ্রমহিলা? ক্ষীণ গলায় বললাম, যাঁকে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল? বানী... হ্যাঁ, মনে পড়েছে—বানী সেন।

নার্স বলল, ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

হঠাৎ আমার কাছেই খুব চেনা এক কণ্ঠস্বর, যে গলা আমি শুনতে পেতাম বুকের ভিতর থেকে। অবিকল তেমন উচ্চারণ, ভারি মিষ্টি আওয়াজখানা।

দিদি ভাল আছে। পড়ে যায়নি শেষ পর্যন্ত ট্রেন থেকে। কামরার সিঁড়ির দু পাশে যে হ্যান্ডেল থাকে, চট করে সেটা ধরে ফেলতে পেরেছিল। ট্রেন থেমে গিয়েছিল। চোট লাগেনি।

তুমি কে?

মাথার পিছন দিক থেকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক অসাধারণ সুন্দরী তরুনী সামনে এগিয়ে এল।

আমি কি স্বপ্ন দেখছি? এ-মুখ আমার খুব চেনা। সেই মানসচারিনী—চেঁচিয়ে উঠলাম, রানি?

হ্যাঁ, রানি। ঠিক ধরেছেন। আমি রানি সেন। দিদি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছে। আপনি ঘুমোন। গুণ্ডাগুলো সব ধরা পড়েছে, ভয় নেই। আমি পাশে আছি। হাতে পিঠে চোট আছে। মাথায় লাগেনি। সেরে উঠবেন।

তুমি রানি? সত্যিই? আমার গলা কেঁপে ওঠে আবেগে।

হ্যাঁ বললাম তো! দিদিও এতক্ষণ ছিল। ডাক্তারবাবু বোলপুর থেকে কী একটা ওষুধ কিনতে বলছেন। লিখে দেবেন। দিদিকে ডেকে আনি? ওকে এখানে রেখে বরং আমি ওষুধটা কিনতে যাই, সাইকেল আছে। চিত্রা সিনেমার মোড়, কত আর দূর!

রানি তুমি চলে যাবে?

মেয়েটি কাছে এসে আমার বুকে হাত রাখল। ঝাপসা চোখে মিলিয়ে নিচ্ছি। সেই চোখ নাক। সেই ঠোঁট। সেই সুগভীর চাহনি। তেমনই মাথার চুল। গায়ের রঙে ঔজ্জ্বল্য। না, চিনতে ভুল হয়নি আমার।

আকুল স্বরে শুধোলাম, আসবে তো? আর হারিয়ে যাবে না?

মেয়েটি তার কুয়োর মতো অথৈ চোখ থেকে দুই গাল বেয়ে গড়িয়ে আসা জলের ধারা হাত বুলিয়ে মুছে নেওয়ার চেষ্টা করে বলল, না। কোনও দিনও না।

ক্রশ কানেকশন কালেকশন

প্রেমের জটিলতা, মজা, কষ্ট, অসহিষ্ণুতা, ভুল বোঝাবুঝি, কথা কাটাকাটি এসব নিয়েই ছবি ক্রস 'কানেকশন-২'। এতে আছে দুটি জুটি, একদিকে রিমঝিম মিত্র ও ঋত্বিক চক্রবর্তী, অপর দিকে তনুশ্রী চক্রবর্তী ও শায়ন মুন্সী। ছবির বিষয়বস্তু তো হল, এবার ছবির 'লুক ও কিছু বিশেষ মুহূর্ত রইল সুবিধার পাঠকের জন্য। ছবির প্রযোজক বিক্রম ডব্লু এন্টারটেনমেন্ট ও পরিচালক অভিজিৎ গুহ-সুদেষ্ণা রায়। ক্রস কানেকশন-২এর পোশাক সম্ভার আজকের ছেলে মেয়েদের রুচি ও চেতনাকে মাথায় রেখেই জোগাড় করা হয়। সাহায্য করেন সাবর্নী দাস ও পায়েল দত্ত। সুবিধার পাঠকদের মতামত কাম্য।

বাঙালি ভ্রমণ বিলাসী। আর এই ভ্রমণের বীজ তাদের মধ্যে আজকে বপন হয়নি, বহু বছর ধরে বাঙালি বেড়াচ্ছে। কিন্তু তার এই বিলাস, ওই বেড়ানোয় এসেছে নানা পরিবর্তন, নানা নতুন আঙ্গিক। বেড়ানোর একাল সেকাল নিয়ে লিখেছেন চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ফিরে দেখা হয় নাই

জন্ম থেকেই মানুষের মধ্যে ভ্রমণের আনন্দ বিদ্যমান। প্রস্তরযুগে মানুষ ভ্রমণ বুঝত না। খাবারের সন্ধানে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে যেত। যেখানে খাবার পেত সেখানের জায়গাটা ভাল লাগত। এই ভাল লাগার সুপ্ত ইচ্ছেটা আজ ভ্রমণে পর্যবসিত। পুরাকালে রাজা মহারাজারা 'বিহারে' যেতেন। সেটাই ভ্রমণ। দিন বদলের হিসেবে ভ্রমণেরও রূপবদল হয়েছে। সপ্তডিঙা সাজিয়ে রাজা ভ্রমণে বার হতেন। সঙ্গে লোকলস্কর, পেয়াদা, পাটরানি, সুয়োরানি, দুয়োরানি, আটরানি, অথবা চতুর্দোলা সাজিয়ে মৃগয়ায়। আমাদের এখনকার ডুয়ার্স কিম্বা কানহা দর্শনের মতো। তবে সে তো এখনকার মতো ঝাঁকি দর্শন ছিল না। ছিল এলাহি ব্যাপার। খাজনার থেকে বাজনা বেশি।

বিভিন্ন যুগে রাজা-মহারাজাদের আমলে ভারতবর্ষের শ্রী বৃদ্ধি হতে থাকল। মন্দির, দুর্গ, প্রাসাদ, কেল্লা গড়ে উঠতে থাকল। তাঁরা ছিলেন দূরদর্শী। জানতেন ভবিষ্যতের গর্ভে 'প্যাকেজ ভ্রমণ' নামে একধরনের প্রোডাক্ট বাজারে আসবে যার দৌলতে এ স্থাপত্যগুলো হয়ে উঠবে দ্রষ্টব্য। রাজার নাম ফাটবে। 'আপুনার ঢাক আপুনি পিটাও।' পৃথিবীর সব মহাপুরুষই নিজের ঢাক নিজে পিটিয়েছেন। অনেকে আবার অন্যের পিঠে ঢাক চাপিয়ে নিজে বাজিয়েছেন। তাঁরা ঢাক পিটিয়েছেন বলেই আমরা ভ্রমণেচ্ছু।

তীর্থযাত্রা বা তীর্থ ভ্রমণ আমাদের আদি যুগ থেকে বর্তমান। আমাদের প্রথম ভ্রমণবিলাসী শ্রীরামচন্দ্র। চাপে পড়ে সপরিবারে বনবাস। বনবাস নয়তো বনবাঁশ। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াও। পর্ণকুটির তৈরি করে থাকো। জঙ্গলের শোভা দেখ, জীবজন্তু দেখ। এখনকার ফরেস্ট বাংলোয় থাকার মতোই। শ্রীরামচন্দ্রের মতো বনবাঁশ কপালে জুটেছিল পাণ্ডবদেরও। তাঁরাও তীর্থ করতে বার হয়েছিলেন। মহাপুরুষেরা যে যে পথে ভ্রমণ করেছিলেন সে পথ গুলোই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ট্রেকিং রুট হয়ে উঠল। যেখানে গেছেন পদচিহ্ন রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'যখন গিয়েছ চলে/দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।' সত্যিই তাই। ভরত রাজা মা গঙ্গাকে শঙ্খ বাজিয়ে নিয়ে এলেন ধরাধামে। স্রোতস্বিনী মা গঙ্গা আপন ছন্দে বেঁধে নিলেন তাঁর চলার রাস্তা। কিশোরী চঞ্চলা বালিকার মতো তাঁর চলন। সে পথও হয়ে উঠলো ভবিষ্যতের বেড়ানোর জায়গা। আদিকাল ধরে চলে আসছে উৎস সন্ধানে মানুষের ঘুরে বেড়ানো।

দিন বদলায়। নদীপথ অথবা পালকি চড়ে বাবুদের ভ্রমণ শুরু হয়। সে ভ্রমণ নিছকই তীর্থযাত্রা। পর্দানসীন বিবিদের কাছে পথের শোভা দেখার পথ ছিল পাল্কির দরজার ভেতর বদ্ধ। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ ছুঁয়ে পাল্কি চলে যেত দূর অজানায়। ১৭৫৭। সিরাজদৌল্লার পরাজয়ে স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গেল। ব্রিটিশ সিংহ ভারত শাসনের দায়িত্ব নিল। গ্রাম কলকাতা হয়ে উঠল তাদের রাজধানী। ক্রমে গ্রাম কলকাতা শহর হয়ে উঠতে লাগল। কারণ দেশ চালাতে গেলে শাসন কায়েম রাখতে গেলে আগে দরকার বাসস্থানটা ঠিক করার। কিন্তু সে পোড়া কলকাতায় না ছিল কোনও শ্রী, না ছিল কোনও কৌলিন্য। চারদিকে শুধু কালো মানুষ, হোগলা পাতায় ছাওয়া ঘর। মশা আর শকুনের সহাবস্থান। থাকার মধ্যে শুধু বয়ে যাওয়া গঙ্গা আর পুরনো কেল্লার সামনে একটা দিঘি। লোকে বলে সাবর্ণচৌধুরিদের বাড়ির কন্যারা দোলের দিন আবির খেলে এখানে চান

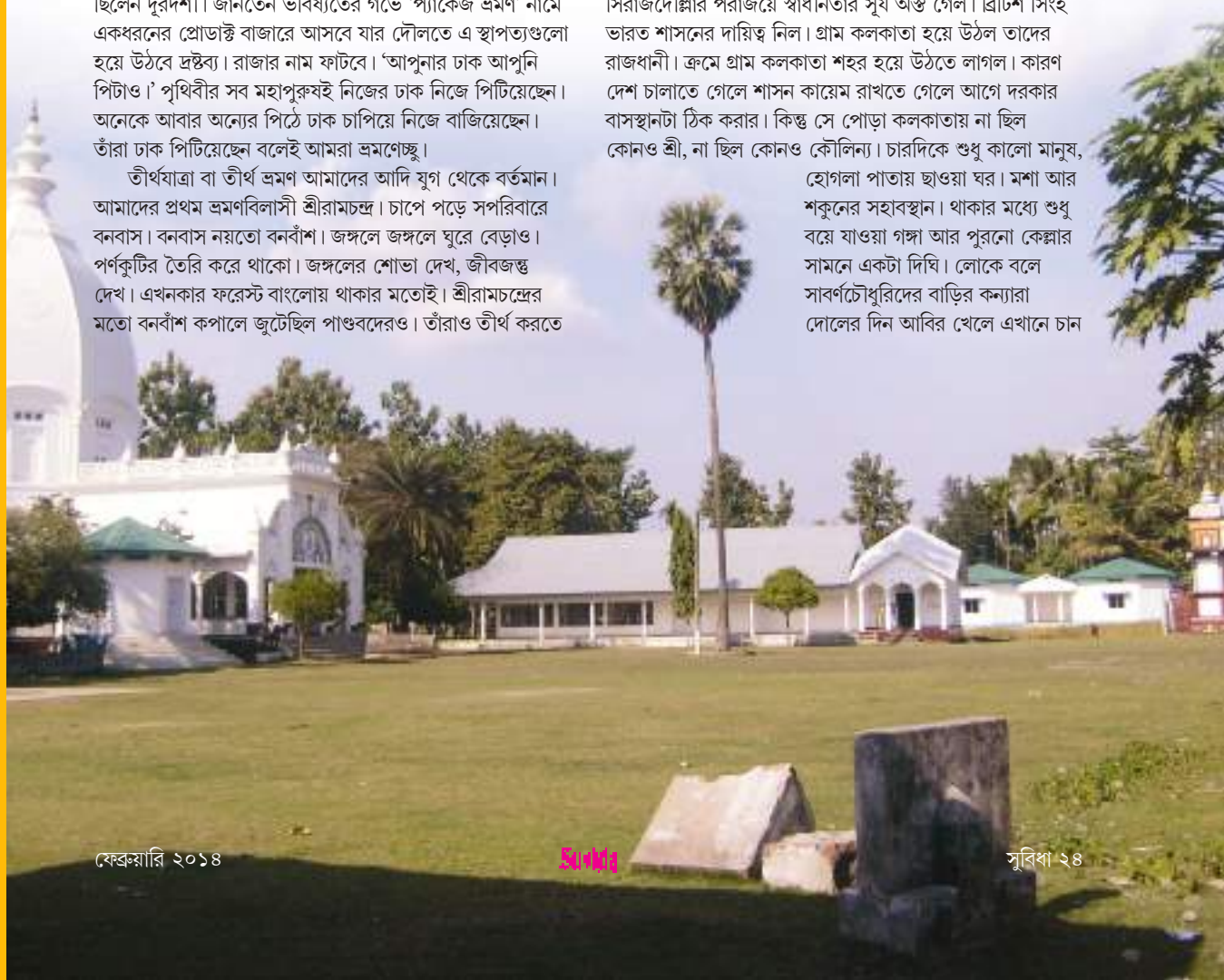

করত। জল লাল হয়ে যেত। তার থেকে নাম লালদিঘী। কিন্তু ব্রিটিশ শিষ্টাচারে ভ্রমণ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জঙ্গলে ভ্রমণ হবে কোথায়! কুছ পরোয়া নেই। চলো গঙ্গার পাড় বাঁধাতে শুরু করো। ছুটলো অটো। শহর বানাও অধুনা পার্কস্ট্রিট অবধি চললো সে সংস্কার। পার্কস্ট্রিটের তখনকার নাম ছিল 'বেরিং গ্রাউন্ড রোড'। এরও আগে বাদামতলা অঞ্চলে ওই রাস্তা দিয়ে মরা বয়ে নিয়ে গিয়ে মল্লিকবাজারের কবরখানায় সমাধি দেওয়া হতো। ওই পার্কস্ট্রিটের সামনে দাঁড় করানো হতো নানা ধরনের ঘোড়ার গাড়ি। ফিটন, ব্রুহাম, ল্যান্ডো। পার্কস্ট্রিটের মোড়ে তখন ইংরেজ প্রথম বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পের বাড়ি। তাঁর নিজস্ব বাড়ির সামনে ছিল একটা ডিয়ার পার্ক। সেই থেকে রাস্তার নামকরণ পাকস্ট্রিট। এই পার্কস্ট্রিট ধরে ব্রিটিশ সাহেব মেমদের কলকাতা ভ্রমণ শুরু হল গঙ্গার তীরে, ঘোড়ার গাড়ি চেপে। নেটিভদের সে পথে আসা মানা।

আর তখন গ্রাম কলকাতার মানুষজনের কাছে ভ্রমণ ব্যাপারটি ছিল স্বপ্নের দূর প্রকোষ্ঠে। ইংরেজদের বদান্যতায় গড়ে উঠল বাবু সমাজ। হোগলা পাতার বস্তির পাশে গড়ে উঠল বড় বড় ইমারত, অট্টালিকা। মুর্গিহাটা হয়ে চিৎপুর পর্যন্ত এই নেটিভ টাউন। ঝাড়লণ্ঠন লাগানো জলসাঘর। দোমহলা বাড়ি। অন্দরমহল আর বারমহল। অপর মহলের বিবিরা রইলেন পর্দার ওপারে। আর বার মহলে বাবুরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পিয়ারীবাঈদের নিয়ে। সঙ্গে সুরার সঙ্গত। মাঝেমধ্যে বাবুদের সাধ যেত বাড়ির বিবিকে নিয়ে 'পশ্চিমে হাওয়া খেতে'। বাবু যেতেন সঙ্গে মোসাহেব, ঠাকুরমশাই, লাঠিয়াল, গোমস্তা সবাই। বাঈজীদেরও যেতে হতো। তাদের আলাদা নৌকো থাকত। এ ভ্রমণ সুখের নয়, এতে লেগে থাকতো বড়লোকি অহমিকা। বাবুদের বিবিরা মাঝে মধ্যে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে ঘরের পর্দাটুকু সরিয়ে ভ্রমণে যেতেন। তবে সে যাওয়া ছিল ওই পাল্কি চড়েই। পাল্কি শুদ্ধু গঙ্গায় চোবানো হতো আবার সেই পাল্কি চেপেই অন্দরমহলের চৌকাঠ অবধি ।

বাঙালি জীবনে ভ্রমণের পালে হাওয়া লাগল যখন থেকে স্টিম ইঞ্জিন চালু হল। কাঠের পাটাতন দেওয়া বেঞ্চি। কাঠের দরজা লাগানো বগি বাঙালি বাবুরা বার হলেন ভ্রমণ দিগ্বিজয়ে। বাবু কলকাতার রেশ তখন পতনের দিকে। বুলবুলির লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো, পায়রা পোষা। বাবু সম্প্রদায় তখন ধুঁকছে। শহর কলকাতায় তৈরি হল যৌথ পরিবার। বড় বড় অট্টালিকার থামের আড়ালে বট গাছের চারা উঁকি মারছে। ঠাকুরদালানে গ্যাসবাতি হাতে ধরা ভেনাসের মূর্তিগুলোয় অযত্নের ছাপ। তবু বাবুর নাতি এখন সংসারের কর্তা। কর্তা বেড়াতে যাবেন। কিন্তু যাবেন কোথায়? হোটেলের কনসেপ্ট তখনও চালু হয়নি। কোনও চিন্তা নেই, চলো মধুপুর। ওখানে জল, আবহাওয়া ভাল। কিনেই নিলেন জমি। গড়ে উঠলো বাড়ি পাঁচ/দশ বিঘা জমির উপর নাম হল নয়ন-ভিলা। লোকে বলতো বাঁড়ুজ্যে বাড়ি। এভাবেই তখন বিভিন্ন জায়গায় বাঙালির ভ্রমণপিয়াসী মন গড়ে তুলল বাড়ি। থাকবার জায়গা। মধুপুর, গিরিডি, ঘাটশিলা, দেওঘর, বেনারস, পুরী হয়ে উঠল বাঙালি জীবনের দ্বিতীয় হোমল্যান্ড। যাঁদের বাড়ি করার সামর্থ ছিল না তাঁরা নিছকই বেড়াতে যেতেন এবং গিয়ে উঠতেন এইসব বাড়িতে। বাড়ির মালিকেরা আনন্দের সঙ্গে ঘরের চাবি দিয়ে দিতেন চেনা-অচেনা মানুষদের।

যাওয়া মানে তো যাওয়া নয়, সে এক ব্যাপার। বাড়ির কর্তা পুরো বগি রিজার্ভ করে বেড়াতে যাবেন। সঙ্গে যাবেন স্ত্রী, সন্তান, বিধবা মা, বিধবা পিসি, ছোট ভাই, কাকিমা, ফুলদা, বাড়ির শান্তি জেঠি, তার ভাসুরের ছেলের বৌ, ছেলে, বড়দার মেয়ে, মেজদার ছেলেরা, সেজভাই, গ্রামতুতো কাকা-কাকি তাদের চারজন ছেলেমেয়ে। আর যাবে হারুর মা রান্নার জন্য, গোরার ভাই ফাই ফরমাসের জন্য। বাকি তো নিজের সংসার। গলা অবধি ঘোমটা টানা কুড়ি বছরের দাম্পত্য জীবন কাটানো বউ, তিনটি ছেলে মেয়ের সঙ্গে একমাসের খোরাকি। চাল, ডাল, আটা, সুজি, মুড়ি, গোপাল ঠাকুর, তুলসীর মালা, গীতা, বাড়ির টিয়া পাখি খাঁচা সহ।

আর অবশ্যই যাবে তিন-চারটে জিনিস। এক ইকমিক কুকার। এটা ছাড়া তখনকার দিনের ভ্রমণ ছিল অচল। দুই, সবুজ শালুতে মোড়া বড় স্টিলের জলের বোতল। সামনে ছোট কল বসানো। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই ধরনের বোতল আসত বিলেত থেকে। লোকে বলত মিলিটারি বোতল। তিন হোল্ডঅল। এই হোল্ডঅল এ বাঁধা থাকতো সবার বিছানা। একটা পাতলা তোষক। একদিকে মাথার বালিশ একটা। অন্যদিকে চাদর, শাল, জুতো মোজা। মধ্যিখানে আরও কিছু জিনিস। একমাথা থেকে মোড়া হত । জিনিসের ভারে এতটাই মোটা হয়ে যেত যে, টানাটানি করেও স্ট্র্যাপ লাগত না। একজনকে ওপরে চড়ে বসে তবে আটকাতে হত। তারপর নারকোল দড়ি দিয়ে বাঁধা হত। চার, টিনের ট্রাঙ্ক অথবা কুমিরের চামড়ার সুটকেস। ওই কুমিরের চামড়ার সুটকেস ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। কোথায় লাগে এখনকার স্যামসোনাইট বা অ্যারিস্ট্রোকেট। দু তিন প্রজন্ম ধরে এটা বাড়ির ঐতিহ্য। গন্তব্য স্টেশনে নেমে গরুর গাড়ি চড়ে 'ভিলা'য় যাওয়া।

ওখানে বেড়াতে গিয়ে কঠিন নিয়মের মধ্যে থাকতে হতো। শুধু পড়াশুনো থেকে বাচ্চাদের ছুটি। মা-কাকিদের রুটিন একই। সকালে উঠে জলখাবারের লুচি, আলুর ছেঁচকি তৈরি করা। পিসির ছিল পান তৈরি করার দায়িত্ব। জলখাবারের পর দুপুরের খাওয়ার তোড়জোড়। ডাল-ভাত-বেগুনভাজা আর কচি পাঁঠার ঝোল। মায়েদের খাওয়া শেষ হতে হতে দুপুর গড়াতো। তারপর মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে মায়েরা বসতেন বিন্তি খেলতে। বাবারা সামনের বাগানে গাছের তলায় দাবা খেলতেন। বিকেল হলেই চা।

সকালে উঠে বাচ্চাদের নিয়ম ছিল সেজো কাকুর সঙ্গে ব্যায়াম করা। তারপর ছোলা ভেজান খেয়ে সোজা মাইল দুয়েক হেঁটে আসা। ফিরে এসে খেলা। তারপর ইঁদারার জলে চান করা। দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে গাছে চড়া অথবা ঘুমানো। বিকেলের চা খাওয়া হলে সবাই মিলে বার হওয়া হতো। এটাই মজার সময়। লাইন দিয়ে সবাই একসঙ্গে চলেছে। বাড়ির কর্তা গায়ে কোট, মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ, গলায় মাফলার, পায়ে মোজা-ক্যাম্বিসের জুতো। মায়েদের গায়ে শুধু জামেয়ার শাল। সবাই গিয়ে উঠতো ফাঁকা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। দূরে শালগাছের মাথায় চাঁদ উঁকি দিতো। অনেকক্ষণ গল্প করে আবার বাড়ির পথে হাঁটা।

উচ্চবিত্ত সাহেবদের তৈরি দার্জিলিং-এ অথবা কালিম্পং-এও সাহেবদের দেখাদেখি যাওয়া শুরু করলেন তারা। বাড়িও কিনতে লাগল। কিন্তু যাওয়াটা ছিল এক ঝকমারি। তখনও ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরি হয়নি। এপার অবধি ট্রেন। নৌকো নিয়ে ফারাক্কার ভাগিরথী পার হয়ে ওপারে গিয়ে আবার ট্রেন ধরে এনজিপি। সেখান থেকে টাট্টু ঘোড়ায় তিনদিনের পথ দার্জিলিং। তখনও টয় ট্রেন হয়নি।

দিন বদলে আমাদের জীবনে এল 'হানিমুন' শব্দটি। বাঙালি জীবনে সংযোজিত হল 'দী-পু-দা'। দীঘা, পুরী, দার্জিলিং। যৌথ পরিবার এখন অস্তমিত। হাম দো, হামারা দো। ছোট সংসার। এখন আর নেই বগি ভাড়া নিয়ে বেড়াতে যাওয়া। একলা চলো রে। হোল্ডঅল্ড, টিনের তোরঙ্গ সবই অবসলিট। এখন হাই ফাই যুগ। নিত্য নতুন আবিষ্কারে মগ্ন মন। হাত বাড়ালেই পথ। পথ খুলে দিল ইন্টারনেট। ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রাম হয়ে উঠল টুরিস্ট স্পট। ভ্রমণ নিয়ে গবেষণায় মাতল বিভিন্ন ট্যুর অপারেটার। সবই গ্লোবালাইজেশন। যেখানে কেউ আগে যায়নি, সেখানে আমিই প্রথম যাব। আমিই হব কলম্বাস। সময় কোথায় এখন একমাস ধরে বাইরে থাকার। কর্পোরেট অফিসে বেচুবাবুর কাজ করি। টার্গেট মেটাতেই জীবন অন্ত। সংসারে সময় দেওয়ার মতো সময় কোথায়! তিনটে সি এল নিয়ে বড়জোর পাঁচদিন উইকএন্ড মিলিয়ে। ঘোরার জন্যে ওই যথেষ্ট। মানুষের ঘুম চলে গিয়ে এসেছে ন্যাপ। ভ্রমণেও তাই। ছুটি বলে কিছু নেই। স্ট্রেস ফ্রি করতে তিনদিন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো। ছবি তোলা ফেসবুকে আপলোড করা। বাবু পড়লেন লা কস্ত-এর গেঞ্জি আর বারমুডা, গিন্নির পরনে গেঞ্জি আর জিনস। হাল্কা ট্রলি ব্যাগ। মন চল নিজ নিকেতনে। ঘুরতে যাবার আগেই মনে হয় সময় শেষ। অফিসের বসের মুখ পেছনে তাড়া করছে। সঙ্গে সঙ্গী মোবাইল। জঙ্গলে চিতা দেখছি। বসের গলা ভেসে এলো দৈববাণীর মতো মোবাইলে। 'টার্গেট'টা মনে আছে তো।' স্বপ্ন, প্রেম চটকে চল্লিশ।

মধুপুর দেওঘর, বেনারস সব গেঁয়ো জায়গা এখন। এখন চাই ঝাঁ চকচকে রিসর্টওয়ালা ভ্রমণ। অথবা ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুর। কেষ্ট বিষ্টু মানুষ আবার দার্জিলিং-এর কাছে গিয়েও সেখানে যান না। বড্ড কনজেস্টেড। তাই চা-বাগানের মধ্যে থাকব। দূর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখব। ইকো ট্যুরিজম। নয়তো সোজা যাই চলো বাই বাই ব্যাংকক। দেশে আর দেখে কী হবে! চারটি মন্দির, ভেঙে পড়া কেল্লা, ডুয়ার্স-এর চেয়ে বিদেশে অনেক বেশি উদ্দামতা। জীবনটাই তো এখন 'ইট-ড্রিংক অ্যান্ড বি মেরি।'

সরস্বতী পুজো

সোমনাথ বেনিয়া

সরস্বতী পুজো মানেই পাড় না ভাঙা শাড়ি
রাতের ব্যাকুল স্বপ্নে বেলকুঁড়ির সুবাস
নিজের মধ্যে জেগে ওঠা অগোছালো কথা, বীণা পাণির
তারে আড়চোখের স্বরলিপি হয়ে যাওয়া...

এখন,
ঢেউহীন নদীর পাড়
ছায়াহীন মাঠের উন্মাদনা
সব কিছুই জলের উপর হাঁসের শীর্ষাসনের জলজ অধ্যায়

কষা কুলের মতো আলতো প্রেমের ভাষাগুলো যেন
বোতল বন্দি সফট ড্রিঙ্কের ঝাঁঝ ...

একদিকে চরম উৎকণ্ঠা
অন্যদিকে মন জুড়ে ফ্রিজের বরফ শীতলতা
অথচ দেখ,
প্রথম প্রেম হেঁটে যাচ্ছে
পথের দু-ধারে শরীর ফেরত পারফিউমের লাজু ফিসফাস

কত কথা হয়ে যায় না বলেই!

এমনকী, বিরহ সাঁতরে পেরোয় মনের দিগন্ত রেখা
সরস্বতীর সামনে মেহেন্দি হাতে কুচো ফুল,
ফুলের মধ্যে বুকের পেলব শব্দ রাখা ...!

চোখে স্বপ্ন আঁকা

বিপ্লবকুমার বিশ্বাস

আজ বারো আনা কেটেছে জীবনের
আর মাত্র ক'টা দিন হয়ত বাকি ;
হয়তো নদী বইবে না আর
কিংবা কি হবে দু-দিনের খেলা ঘরে—
চোখে স্বপ্ন এঁকে!
মনে পড়ে? জোয়ার-ভাঁটার অমোঘ বাণী
একাদশীর চাঁদ ছুঁয়ে গেছে কত দূর...
গাছ-গাছালি উবে গেছে নতুন ভঙ্গিতে,
শ্বাস প্রায় যায় যায়।
হয়তো এখুনি গগণচুম্বী দালান—
আলগোছে তুলে নেবে, গোপনে
অথবা বাঁকা চোখে গাছের মৃত্যু!
কার চোখে ক্ষীণ প্রতিজ্ঞা—
'গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও' (অন্তরে)
'একটি গাছ একটি প্রাণ'— সৌজন্যে?
অথচ এর চেয়ে বেশি সবুজ দেখেছি আমি গত শতাব্দীতে।
'গাছ যদি না থাকে, চোখে স্বপ্ন আঁকা মুক্ত বায়ু, সুপ্ত
জীবন—ব্যর্থ বেঁচে থাকা।'

ফেরা

সুমন চট্টোপাধ্যায়

তুমিও বুঝি ফিরবে?
কথা তো ছিল না এমন,
একশো আট বিল্লপত্র
হাজার ঘণ্টার বিকট আস্বাদ,
আলপিনে বুক ফুটে
লালা ঝরা ন্যাংটো মনের
আড়াল পেরিয়ে যাওয়া—

কথা তো ছিল না ফিরবে।
ফিরে আসে স্রোত
আসে ফিরে বসন্তও
বুকে পিঠে ফিরে আসে স্নায়ু,

তুমিও এসো
যদিও কথা ছিল না এমন
তুমিও ফিরবে।

শীতের শেষের সমস্যা ও সমাধান

শীত বিদায় নেওয়ার শেষ পর্ব উপস্থিত। রাতের দিকে যদি বা একটু আধটু ঠাণ্ডা পড়ে দিনের বেলা বেশ গরম। স্বাভাবিকভাবেই এই আবহাওয়া ভাবিয়ে তুলেছে মায়েদের। তাঁদের কপালে এখন চিন্তার ভাঁজ। ভাবছেন, এই ঋতু পরিবর্তনে তাঁদের আদরের সোনামণি অসুস্থ হয়ে পড়বে না তো! যদিও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে শিশুকে সুস্থ রাখা তেমন কঠিন কিছু নয়। কী কী সমস্যা এ সময়ে শিশুদের হতে পারে, তার প্রতিকার এবং প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে আগাম পরামর্শ দিলেন এস এস কে এম হাসপাতালের পেডিয়্যাট্রিক মেডিসিন বিভাগের অ্যাসিসটান্ট প্রফেসর অ্যান্ড ভিজিটিং কনসালটেন্ট

ডাঃ শুভম ভট্টাচার্য

শীত বিদায় নিয়ে গরম আসার প্রাক্কালে শিশুদের মূলত চার ধরনের সমস্যা হয়। ভাইরাল ফিভার, মাম্পস, মিজলস এবং চিকেন পক্স। নাম আলাদা হলেও সব কটা সমস্যার জন্যই আসলে দায়ী ভাইরাস। ঠাণ্ডা-গরম আবহাওয়ায় এই ভাইরাস অতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে যায়। এর সংক্রমণেই অসময়ে ঘরে ঘরে অসুখ-বিসুখ দেখা দেয়।

ভাইরাল ফিভার

স্কুলের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের এটা খুব কমন সমস্যা। অসুখটা শ্বাসনালী সংক্রমণের মাধ্যমে অর্থাৎ হাঁচি, কাশির মাধ্যমে একজনের থেকে অন্য জনে ছড়িয়ে পড়ে। এই অসুখের প্রাথমিক উপসর্গ হল অল্প সর্দি, কাশি, চোখ লাল হওয়া, নাক দিয়ে জল পড়া, জ্বর পরবর্তীতে হতে পারে পাতলা পায়খানাও। এইসব লক্ষণ দেখে অনেক সময়ই বাবা-মায়েরা অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ খাইয়ে দেন। যদিও তা একেবারেই করা উচিত নয়। ভাইরাল ফিভার হলে জ্বর নামানোর ওষুধ দেওয়া দরকার, জ্বর না কমলে শিশু চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।

খাওয়া দাওয়া স্বাভাবিক থাকবে। অর্থাৎ সহজপাচ্য, সুষম বাড়ির খাবার শিশুকে খাওয়াতে হবে। কোনও বাইরের খাবার দেওয়া চলবে না। নিয়মিত স্নান করাতেও বাধা নেই। আর যেহেতু একজন শিশু থেকে সহজেই অন্যজনে ছড়িয়ে পড়ে, তাই ভাইরাল ফিভার হলে অন্তত তিনদিন শিশুকে প্লে সেন্টার, স্কুল বা কোচিং সেন্টারে না পাঠানোই ভাল।

মাম্পস

মাম্পসও এক ধরনের ভাইরাল ইনফেকশন জনিত অসুখ। এই সংক্রমণ হয় প্যারোটিড গ্ল্যান্ড-এ। ফলে প্যারোটিড গ্রন্থির প্রদাহ দেখা দেয়। কানের ঠিক সামনে গালের একটি অংশ ফুলে যায়। জায়গাটা লাল হয়, মুখে লালা নিঃসরণের পরিমাণ যায় কমে, মুখের ভেতরটা শুকিয়ে যায়, খিদে কমে যায়। এই সমস্যা একদিকে বা দুদিকের গালেই হতে পারে।

ইনফেকশন মূলত ছড়ায় হাঁচি, কাশি এমনকী হাসির মাধ্যমেও—আক্রান্ত ব্যক্তির গ্লাসে জল খেলেও অসুখ হতে পারে। শিশুর মাম্পস হয়েছে বুঝতে পারলে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শমতো চিকিৎসা করানো উচিত। যেহেতু ভাইরাল ইনফেকশন তাই এক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া চলবে না। কী ওষুধ দিতে হবে তা চিকিৎসকই ঠিক করবেন। খেয়াল রাখতে হবে শিশুর তাপমাত্রা কেমন থাকছে তার উপর। তবে অসুখটা খুব বেশি ভয়ংকর নয়। খুব কম ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা দেখা দিলেও তা সারানো অসম্ভব নয়। এখন সরকারি উদ্যোগেও মাম্পস-এর প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হচ্ছে। শিশুর ১৫-১৮ মাস বয়সে এই টিকা দেওয়া থাকলে মাম্পস হওয়ার আশঙ্কা অনেকাংশে কমে যায়। আবার হলেও তা তেমন জটিল আকার ধারণ করতে পারে না।

মিজলস বা হাম

মিজলস বা হাম বোঝার উপায় হল প্রথমদিকে জ্বর থাকে। তারপর গায়ে র‍্যাশ বেরয়। র‍্যাশগুলো বেরতে শুরু করে কানের পিছন দিক থেকে। আস্তে আস্তে ২-৩ দিনে তা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শরীরে। পরবর্তী দিন তিনেকের মধ্যে আবার তা মিলিয়েও যায়। তবে র‍্যাশ বেরনোর সময় চোখ লাল হয়, নাক দিয়ে জল পড়ে এবং তাপমাত্রা অনেক উঠে যায়। র‍্যাশ বেরিয়ে গেলে তাপমাত্রা আবার কমে যায়।

অনেক অভিভাবক শিশুর গায়ে কোনও রকম র‍্যাশ দেখলেই ভাবেন হাম হয়েছে। সেই অনুযায়ী চিকিৎসার কথাও ভাবেন। এটা একদম ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে র‍্যাশ যদি কানের পিছন দিক থেকে শুরু না হয়, শিশুর শরীরের তাপমাত্রা ১০২-১০৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড না হয়, চোখ লাল না হয় তাহলে তা মিজলস নয়।

হাম গায়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরে আবার তাপমাত্রা কমতে থাকে। আমাদের দেশে এই অসুখটা শিশুদের মধ্যে হয়ও বেশি। এই অসুখে মৃত্যুর হারও যথেষ্ট।

রোগটা যেহেতু ভাইরাস ঘটিত এবং সহজেই একজন শিশু থেকে অন্যজনে ছড়িয়ে পড়ে তাই প্রথমেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। জ্বর হলে জ্বরের ওষুধ দিতে হয়। শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাও খুব জরুরি। এই অসুখের প্রতিষেধক টিকা বেরিয়ে গেছে। বাচ্চাদের তা নিয়ম করে দেওয়া দরকার। ৯-১২ মাসে সমস্ত বাচ্চাকে এই প্রতিষেধক দেওয়া বাধ্যতামূলক। এ বিষয়ে গাফিলতি করার কোনও জায়গা নেই।

চিকেন পক্স

শীতের শেষে এই অসুখের আশঙ্কা থাকে যথেষ্ট। প্রথম ২-৩ দিন শিশুর শারীরিক অস্বস্তি হয়। গা-হাত-পায়ে ব্যথা। অল্পস্বল্প জ্বর থাকে। র‍্যাশ বেরনোর সময় জ্বর থাকে। র‍্যাশগুলো পদ্মপাতায় জলের মতো দেখতে হয়। ফোসকার মতো র‍্যাশগুলো প্রথমে বুকে, পিঠে হয়, তারপর সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ে। যতদিন না র‍্যাশগুলো শুকিয়ে কালো হয়ে যায় ততদিন পর্যন্ত তা সংক্রমণ ছড়াতে পারে। এই অসুখটাও খুব ছোঁয়াচে। পরিবারে বড়দের হলেও শিশুকে তার কাছে যেতে দেওয়া উচিত নয়। যদিও ছোট শিশুদের এই রোগে জটিলতা তেমন দেখা যায় না। যত বয়স বাড়তে থাকে রোগের জটিলতাও তত বেশি হয়। কিছু ক্ষেত্রে প্রথমাবস্থায় যদি চিকিৎসা শুরু না হয় তাহলে স্কিন ইনফেকশন ইত্যাদি হতে পারে।

চিকেন পক্স হলেও উপসর্গ অনুযায়ী ওষুধ দিতে হয়। যেমন জ্বর হলে জ্বরের ওষুধ, ব্লিস্টারগুলো চুলকোলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ দিতে হয়।

চিকেন পক্সে আক্রান্ত শিশুকে আলাদা রাখার যৌক্তিকতা থাকলেও নিরামিষ খাবার দেওয়া ঠিক নয়। বরং মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রোটিন জাতীয় খাবার না দিলে সেরে উঠতে দেরি হয়। এমনিতেই এই জাতীয় ভাইরাল ইনফেকশন শরীর দুর্বল করে দেয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয় কমিয়ে। কাজেই অল্প তেল মশলায় রান্না করা মাছ বা মাংস শিশুকে প্রথম দিন থেকেই খাওয়ানো যেতে পারে। চিকেন পক্সে যে নিম, হলুদ ছোঁয়ানোর কথা বলা হয় তার খুব একটা প্রয়োজন হয় না। নিম হলুদের একটা হার্বাল প্রপার্টি আছে যা স্কিনের পক্ষে ভাল, তবে নিয়ম করে দেওয়ার যৌক্তিকতা নেই। এখন এই অসুখও প্রতিরোধ করা যায় প্রতিষেধক টিকার মাধ্যমে। সাধারণত এক বছর বয়সের পর শিশুকে দেওয়া হয় চিকেনপক্সের টিকা।

ম নে রা খু ন

- এ সময় ভাইরাল ইনফেকশন প্রতিরোধের জন্য শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- শিশু বাইরে থেকে ঘুরে এসে হাত সাবান দিয়ে ভাল করে না ধুয়ে চোখে, নাকে মুখে যাতে না দেয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।
- চিকেন পক্স হলে নিরামিষ নয়। বরং মাছ, মাংস খাওয়ান। শিশু দ্রুত সেরে উঠবে।
- শিশুর গায়ে লাল র‍্যাশ মানেই হাম নয়। হাম শুরু হবে কানের পিছন দিক থেকে। হাম বেরনোর সময় তাপমাত্রা থাকে অনেক বেশি।
- চিকেন পক্স প্রথমে বেরয় বুকে পিঠে। তারপর সারা শরীরে। যদি কারও চিকেন পক্সের মতো ফোসকা শরীরের অন্য কোনও জায়গায় দেখা যায় তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এগুলো অন্য কোনও অসুখের উপসর্গ হতে পারে।
- সবচেয়ে বড় কথা শিশুকে সুস্থ রাখার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে মাম্পস, মিজলস, চিকেন পক্সের প্রতিষেধক টিকা দিন। নির্দিষ্ট ডোজে টিকা দিলে শিশুর এই সমস্যাগুলো হয় না। হলেও তা এত নগণ্য পরিমাণে হয় কোনওরকম চিকিৎসার দরকার হয় না।

‘শহিদ মিনারে উঠে গিয়ে বলে দেবো আকাশ ফাটিয়ে...’

নার্সারি থেকেই এখন আমাদের শৈশবের বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড মেলে! ‘প্রেম’ নামক বছর কুড়ি আগের ‘নিষিদ্ধ’ শব্দটিতে বাবা-মায়ের সামনে অনায়াস এখন আজকের যৌবন। এতটাই সে জেনারেশান গ্যাপ-এর মুখে তুড়ি মেরে চকোলেট, গ্রিটিংস-এর সঙ্গে ফর্মাল চুমু অবধি অনুমোদন করে সমাজ সেলিব্রেট করছে ‘ভ্যালেন্টাইন ডে’। তবু তবু আজও কি আমরা ততটাই ভালবাসতে পারি যতটা সমাজ সহ্য করতে পারে? যতটা তার অভ্যস্ত চেতনায় আঘাত না করতে পারে? ধর্ম হোক বা সেক্স কিংবা শুধুই সম্পর্ক, বেচাল হলেই এখনও তুমি নজরবন্দী! কিংবা অনায়াস নগ্ন তোমার ভালবাসার আব্রু? কিন্তু এই চাল বা বেচাল-এর একক নির্ধারণ করবে কে? ‘ভালবাসা’কেই চিঠি পাঠাল প্রীতিকণা পালরায়।

ইন্দ্রকাকু

রাগ কোরো না ইন্দ্রকাকু, এ চিঠি লেখার তাড়না এল মধ্যরাতে, যখন তুমি নেই, অথচ তোমার থাকার কথা ছিল। তোমার তো থাকার কথা এমনকী ঘুমেরও ভিতর। কিন্তু ছিলে না। আর পায়ের নখ থেকে উঠে আসা যন্ত্রণা চোখ বেয়ে যখন চুঁইয়ে পড়ছিল, অপূর্ব এক সৌরভ আচ্ছন্ন করল আমায়। আর আমি সেই নীল, ঘোর নীল, আকণ্ঠ নীলে ডুবতে থাকলাম। তুমি ইন্দ্রকাকু, খুউব খারাপ আছ, তাই না? কাকিমা খুব বকেছে তোমায়? আর বুকাইও? কী বলেছে ওরা? আচ্ছা থাক, তুমি তোমার নীরবতায় থাকো, আগে আমি বলি, কেন ছুটসাটিয়ে লিখতে বসলাম এ চিঠি?

বিধিবদ্ধ স্তর উৎরে চিঠিটা যখন তোমার হাতে পড়বে, তখন রোম, ইংল্যান্ড, আমেরিকা এসব সমুদ্র পাড়ের ভি দেশ কিংবা ভিন্ন ধর্মের মানুষ ছাপিয়ে তোমার দেশ আমার দেশ, আমাদের সমাজ, আমাদের আশপাশও ভালবাসার দিন উদযাপনে ব্যস্ত থাকবে। ভুল বললাম, দিন শুধু নয়, মাস। পুরো ফেব্রুয়ারি মাসটাই নাকি ভালবাসার মাস। পৃথিবী জুড়ে প্রেমাস্পদরা ভালবাসার সমুদ্রে দ্বিধাহীন অবগাহন করতে পারে এসময়। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত যে কোনও উপহার পৌঁছে দিতে পারে ‘...from yours valentine’ লেবেল সাঁটিয়ে। সেই কোন কবের ২৭০ এডি-র এক মৃত্যুপথযাত্রী প্রেমিককে স্মরণ করে এ এসবই করতে পারে ভালবাসায় ভরপুর মানুষজন। ইন্দ্রকাকু, তুমিও তো আমাকে ভালবাসো? আইম জানি, ওই মৃত্যুপথযাত্রী প্রেমিকের মতোই ভালবাসো। আর আমার তো প্রতিটা ..... ওঠা-পড়ায় তুমি। তবে কেন তোমায় বকুনি খেতে হয়? আর আমাকে বুকাই-এর বন্ধুদের টিটকিরি? তবে কেন তুমি আত্মস্থ হয়ে যাও আর আমি তোমাকে ছুঁতে পারি না? তবে কেন তুমি কষ্ট চাপতে প্রাণপণ পড়াশোনাকে আঁকড়াও আর আমি অন্ধকারের সঙ্গে আত্মীয়তা করি? কেন ইন্দ্রকাকু? কী করেছি আমরা? ভালোই তো বেসেছি? যে ভালবাসা সমাজ সেলিব্রেট রছে এমন উচ্চকিতভাবে সেই ভালবাসাই তো আমরাও বেসেছি? গোলমালটা তবে কোথায় বাঁধল? তুমি বিবাহিত? তোমার স্ত্রী আছে? তোমার বুকাই কলেজের ফার্স্ট ইয়ার?... কিন্তু তোমার সংসার তো আমারও খুব প্রিয় ইন্দ্রকাকু। আমিও তো কাকিমা, বুকাইকে খুব ভালবাসি। আমার দিয়ে যাওয়া দই-ফুচকা চেখে কাকিমার চোখ যখন চকচক করে আমারও দেখতে দারুণ লাগে? বুকাই-এর জন্মদিনে ঘর সাজাই মনের টানেই। আমি কি ওদের কোনও ক্ষতি করতে পারি কখনও? কোনওদিনও ভাবতেও পারি? শুধু...শুধু তোমাকে ভালবাসি। ভীষণ ভালবাসি। আমাদের ভালবাসার উদযাপন তো হয় আমাদের মানসিক দাম্পত্যে? তোমার কাছেও তো কোনও দাবি-দাওয়া নেই আমার? বলো, আছে? শুধু আমৃত্যু সঙ্গে থাকার আবদারটুকু ছাড়া? আমি তো আজীবন বিশ্বাস করি, There is only one God and his name is truth... আমার থিসিস পেপার যে আর্দ্ধেক হয়েই পড়ে রইল?...

কাল রাতে তোমাকে ওই অবধি লিখেই থেমে ছিলাম। জানলার পাশে আমার চেয়ারটা তুমি দেখে গেছ, বসেছিলাম সারা রাত। হিমে ভিজছিল ভালবাসা। তন্দ্রা এসেছিল হয়তো। মোবাইলের কাঁপুনিতে চোখ খুললাম। যথেষ্ট সকাল। এত সকালে সুচরিতা? কী ব্যাপার? ভাবলাম তোমার খবর। তড়িঘড়ি ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে ঝকমকে সুচরিতা, জানিস, কী কাণ্ড? আমার বুকে ধরাস। কিন্তু ততক্ষণে ও বলেই চলেছে আমাদের সামনের ফ্ল্যাটের সর্বানী আর মল্লিকাকে দেখেছিলি না?... ওই তো নতুন ভাড়া এসেছে। ইয়ে রে... একসঙ্গে থাকে। বুঝলাম! ... তো কী হয়েছে? বাধ্য হয়েই প্রশ্ন করতে হয়। সুচরিতা যা বলল স্তব্ধ হয়েই শুনলাম এবার। ওদের হাউসিং কমিটির সদস্যরা সাতসকালে হাজির হয়েছে সর্বাণীদের ফ্ল্যাটে, দুজনেই সদ্য ঘুম ভাঙা, নাস্তানাবুদ চলেছে টানা, কী ওদের পরিচয়? ওরা কারা? ওদের পরস্পরের

সম্পর্ক কী? ভদ্রলোকের পাড়ায় এসব...। ধৈর্য ধরে সামলানোর চেষ্টা করেছিল ওরা অবশেষে তুলনামূলক দৃপ্ত মল্লিকা জানায় ওরাও ভদ্রলোক এবং ওরা পরস্পরকে ভালবাসে। ব্যবস্থা নাকি আগেই করা ছিল। অতঃপর একটা ফোন এবং সমাজরক্ষকেরা হাজির। দুজনকে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সুচরিতার যা বলার ছিল বলা হয়ে গেল। ইন্দ্রকাকু, আদরের চেয়েও এসব সময়ে আমার তোমাকে চাই, তুমি জানো। .... ঘাটতি পড়লে কানে চুমু দিতে হয়, মাথায় উত্তাপ বাড়লে হাত বুলিয়ে দিতে হয় আর ইস্টমন্ত্রটা জপতে হয়, আমি আছি তো...। এসব কিছুই তো অন্য সময় হয়ে থাকে, কিনতু এখন হচ্ছে না।

এসো ইন্দ্রকাকু এসো। আমার কাছে বসো। শান্ত করো আমায়। যেদিন তুমি তোমার ডিপার্টমেন্টের রিয়াজউদ্দিন আর রেশমীর গল্প করেছিলে, দুজনেই তুখোড় স্টুডেন্ট, ওদের তৈরি প্রজেক্ট ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড জিতে এলো, ইউনিভার্সিটিকে দারুণ একটা সম্মান এনে দিয়েছে বলে সবাই মিলে সম্বর্ধনা দিয়েছে। কী খুশি ওরা। ওদের বাবা-মায়েরাও। কিন্তু সেই রিয়াজ আর রেশমীর 'প্রেম' হয়ে গেল আর খবরটা চাউর হয়ে গেল ছবিটা নাকি ম্যাজিকের মতই পাল্টে গেল। ধর্ম হয়তো কোতল করল না কিন্তু আজও যা সহজে হয়, রিয়াজ পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পারলেও রেশমীর জীবন সুরক্ষিত হয়ে গেল অতি দ্রুততায় এক কর্পোরেট-এর ঘরণী তকমায়। তুমি বলেছিলে সেদিন শাঁখা সিঁদুর পরে রেশমী কী কারণে ইউনিভার্সিটিতে এসেছিল, সেদিন রিয়াজের ফাঁকা দৃষ্টি নাকি তোমায় এফোঁড় ও ফোঁড় করে দিয়েছিল। সেদিন রাতে ফোনে কতক্ষণ কেঁদেছিলে আমার কাঁধে মাথা রেখে মনে আছে?...

আমিও কাঁদছি ইন্দ্রকাকু। খুউব কাঁদছি খুউব। সেদিন আমার জানলার পাশের নিম গাছটার সবকটা ডালের সবকটা পাতা খসে না গেলে আমি অমন পাগলা হতাম না বোধহয়। ভোরের প্রথম আলোয় দেখা দৃশ্যটা আমার বুক খামচে ধরেছিল। খাঁ খাঁ শূণ্যতা উন্মত্ত করেছিল কতটা নিজেও বুঝিনি। তোমায় পেতে চেয়েছিলাম, সত্যি সেদিন আমি তোমায় পেতে চেয়েছিলাম। ছুটে গিয়েছিলাম তাই। তোমার ঈশ্বরতত্ত্বস্তম্ভ-র ওই ছোট্ট ডিভানটা টানছিল আমায়। কিন্তু আশ্রয় পেতে শোওয়া আর আদর পেতে শোওয়ার ভেতর যে তারতম্য আছে তা বুঝবে কজন? কখন বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর তুমি মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে একা একাই সেই ইস্টমন্ত্র জপছিলে। দৃশ্যটা দেখে কাকিমা জানল আমরা প্রেমে আছি। রাগ করল কাকিমা। অনায়াস আমি আচমকা ব্রাত্য হলাম! কিন্তু ইন্দ্রকাকু সেই মুহূর্তে আমার যাবতীয় অর্গাজম তো হচ্ছিল নিমগাছটার সঙ্গে। এক আর একে কি সবসময় দুই-ই হয়? এগারোও তো হতে পারে? কিংবা শুধুই এক?

জানি, সমাজ থেকে কাকিমা আলাদা হবে কী করে। বুকাই কিংবা বুকাই-এর কলেজের বন্ধুরাও। কিংবা সুচরিতার কমপ্লেকস-এর সদস্যরা। বা রিয়াজ, রেশমীর পরিজনেরা। কিন্তু তুমি বা আমি? কিংবা আমাদের মতো আৰ অনেক আমি-তুমি? এভাবেই ঘরবন্দী বা নজরবন্দী থাকব? তার চেয়ে চলো না পড়া থেকে চোখ তুলে অন্ধকার থেকে মুখ ফিরিয়ে হাত ধরে হাঁটা দিই আলোর পথে। শহিদ মিনারে গিয়ে অল্প থামব। ওখান থেকে দেখব নীচে চলছে লাল রিবন বাঁধা ভালবাসার উৎসব। আর তারপর... তারপর যখন ওরা ক্লান্ত হয়ে আমাদের দেখতে পাবে, দেখতে দেখতে ভিড় বাড়তেই থাকবে, থিক থিক করবে জন সমুদ্র, আমাদের ছুঁতে হাত বাড়াবে, সমাজ আঁচড়ে, কামড়ে হিঁচড়ে আটকাতে পারবে না, দু হাত শূন্যে ছুঁড়ে আকাশ ফাটিয়ে আম বলে উঠব... 'ইন্দ্রকাকু আমার প্রেমিক।"

‘যদি লভ দিলে না প্রাণে’-র মতো ছবিতে আমি আগে কাজ করিনি কখনও !’

ছোট পর্দা দিয়ে কেরিয়ার শুরু। ছোট পর্দার গন্ডি পেরিয়ে কাজের পরিধি ছড়িয়েছে বড়পর্দায়। অভিত্রেী জীবনে একের পর এক সাফল্য। দর্শকদের প্রশ্রয়, ভালবাসা। ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘আবহমান’ ছবিতে অভিনয়ের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ছোট পর্দার ‘সুবর্ণলতায়’, প্রতিবাদী নারী চরিত্রে অভিনয়ের পর তিনি হয়েছেন গ্রাম বাংলার একেবারে ঘরের মেয়ে। ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ছবিতে ডিগ্ল্যামারাইজড চরিত্রে অভিনয়ের পর, এবছর মুক্তি পেতে চলেছে অভিজিৎ গুহ-সুদেষ্ণা রায়ের ছবি ‘যদি লভ দিলে না প্রাণে’। প্রেমের ছবিতে আবিরের বিপরীতে প্রথম অভিনয় থেকে যে কোনও নতুন ছবির প্রস্তুতি, কাজের মজা ও আনন্দ নিয়ে **পূজা মুখোপাধ্যায়**-এর সঙ্গে আড্ডা দিলেন অভিনেত্রী অনন্যা চট্টোপাধ্যায়

সুবিধা : জাতীয়. পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী হয়েও বড় পর্দায় আপনাকে সেভাবে পাওয়া যায় না। সেটা কি আপনার খুঁতখুতানির জন্য? ছবি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেন?

অনন্যা : ছবি নির্বাচনে প্রথমেই গুরুত্ব দিই স্ক্রিপ্টের উপর। তারপরে দেখি ছবির পরিচালক কে। তারপর আসে কোন ব্যানারে ছবি তৈরি হচ্ছে। এই সব মিলিয়েই ছবিতে কাজ করব কি না ঠিক করি।

সুবিধা : কিন্তু বড় ব্যানারের কমার্শিয়াল ছবিতেও আপনাকে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে কী স্ক্রিপ্ট বা ডিরেক্টর মনের মতো হয় না?

অনন্যা : সব মিলিয়ে একটা ভাললাগার প্রশ্ন তো থেকেই যায়। যে কোনও কাজ হাতে নেওয়ার আগে প্রথমেই দেখি ছবির গল্পটা কেমন। গল্পের একটা মাহাত্ম থাকতে হবে। তবে শুধু গল্প ভাল হলেই হল না। তার সঙ্গে ডায়ালগ স্ক্রিপ্ট কেমনভাবে সাজানো হয়েছে, স্ক্রিন প্লে কেমনভাবে তৈরি, সেটা খুব ইম্পটার্ন্ট। তারপরে যে চরিত্রটা আমাকে করতে বলা হয়েছে, তার কতটা অবদান রয়েছে গল্পে এবং তার জন্য আমাকে কতটা বেশি খাটতে হবে, সেটা ডেফিনিটলি দেখি। মানে আমাকে গল্পের চরিত্রের জন্য যতটা বেশি খাটতে হয়, কাজটা তত বেশি ইন্টারেস্টিং এবং চ্যালেঞ্জিং লাগে। কারণ এক্ষেত্রে আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে চরিত্রটাকে।

সুবিধা : আগামী বছরে আপনার কোন কোন ছবি আসছে?

অনন্যা : এরমধ্যে বেশ কয়েকটি ছবিতে কাজ করেছি। তবে সেগুলো রিলিজ এই বছরেই হবে কি না বলা মুশকিল। এ বছর ‘যদি লভ দিলে না প্রাণে’ রিলিজ করছে জানি। ‘আনওয়ার’ রিলিজ হওয়ার কথা রয়েছে। তবে সেটা এ বছর হবে কি না আমি শিওর নই।

সুবিধা : অভিজিৎ গুহ ও সুদেষ্ণা রায়ের ‘যদি লভ দিলে না প্রাণে’ ছবিতে আপনার চরিত্র নিয়ে কিছু বলুন?

অনন্যা : খুব ইন্টারেস্টিং লাভস্টোরি। একটা লাভস্টোরি, যেটা ২০ বছরের টাইম স্প্যান ধরে এগোচ্ছে। এই গল্পে মেয়েটির দীর্ঘদিনের ভালবাসা ওকে তাড়না করে বেড়ায়। সেটা নিয়েই গল্প। ছবির পুরো গল্পটা এখন বলব না, কারণ ছবিটা রিলিজ হবে এ মাসেই। খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে কাজ করতে। প্রথম কথা হল, এই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করিনি আগে। দ্বিতীয় কথা, এটা আর্ট ফিল্ম বা ওই ধরনের সিনেমা নয়। সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ভিন্ন স্বাদের একটা ছবি। এই ধরনের ছবিতে আমি আগে কাজ করেছি বলে মনে পড়ছে না। ছবির নায়ক আবীরের সঙ্গে আমি অবশ্য আগে কাজ করেছি। কিন্তু আবীরের বিপরীতে অভিনয় এই প্রথম। আবীরের বিপরীতে কাজ করে বেশ ভাল লেগেছে। সব মিলিয়ে ভিন্ন মাত্রার একটা ছবি, তাই কাজটা বেশ এনজয় করেছি।

সুবিধা : রানাদা-সুদেষ্ণাদির ইউনিটে কাজ কি এই প্রথম?

অনন্যা : সুদেষ্ণাদির সঙ্গে নন ফিকশন এবং রিয়্যালিটি শোয়ে কাজ করেছি কিন্তু ফিকশনে কাজ এই প্রথম। সুদেষ্ণাদি এবং রানাদাকে অনেক বছর ধরে চিনি। আগে একসঙ্গে অন্য একটা ছবি করার কথা হয়েছিল। তখন আমার আর একটা ছবির সঙ্গে সুদেষ্ণাদিদের ছবির ডেট ক্ল্যাশ করায় সেটাতে কাজ করা হয়নি। ফাইনালি এই ছবিটা হল। এই ছবিটার কথা সুদেষ্ণাদি আমাকে অন্তত পাঁচ বছর আগে বলেছিল। পাঁচ বছর বাদে যখন ছবিটা ওঁরা করল, এবং ফাইনালি কাজটা আমার কাছেই এল, এটা আমার খুব ভাল লেগেছে। তবে খুব রিল্যাক্সড। খুব মজা করে কাজ হয়েছে।

সুবিধা : পরিচালক জুটির সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন?

অনন্যা : সুদেষ্ণাদি রানাদা দুজন একেবারে দু রকমের মানুষ। রানাদা ভীষণ ইমপালসিভ, ইমোশনাল। আর সুদেষ্ণাদি একদম উল্টো। খুব শান্ত, ঠাণ্ডা মানুষ। দুজন দুজনকে খুব ভাল ব্যালেন্স করে। সেটা খুব মজার লাগে ফ্লোরে। সব মিলিয়ে খুবই ভাল এক্সপিরিয়েন্স। সব থেকে বড় বিষয় হল, ওরা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে পারে আর্টিস্টকে। প্যাম্পার করতে পারে। বিশেষত সুদেষ্ণাদি তো খুব প্যাম্পার করে আর্টিস্টদের। কাজেই আমার বেশ ভাল লেগেছে এই ইউনিটের সঙ্গে কাজ করে।

সুবিধা : এই ছবিতে আপনার যে চরিত্র, তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে অনন্যা চট্টোপাধ্যায়ের কতটা মিল?

অনন্যা : ছবির চরিত্রের সঙ্গে খানিক মিল আছে। ইনটেনসিটির দিক থেকে। বহিঃপ্রকাশের দিক থেকে কোনও মিল নেই। ওর ইনটেনসিটির একরকমভাবে বহিঃপ্রকাশ, আমার ইনটেনসিটি, আমার ইমোশনের অন্যরকম বহিঃপ্রকাশ হয়। তবে সিনেমায় আমার যে চরিত্র সে মেয়েটি এমনিতেই অবুঝ, পাগলও বলা যায়। আমাকেও সাধারণভাবে সকলে পাগল বলেই থাকে। আমার ইন্ডাস্ট্রির নামই পাগলি। এই ক্যারেক্টারটিও বেশ পাগল, অবসেসিভ। সেদিকে খানিক মিল আছে বলতে পারেন।

সুবিধা : এখনও নতুন কোনও চরিত্রে অভিনয়ের আগে কী ধরনের প্রস্তুতি নেন?

অনন্যা : যে কোনও ছবিতে কাজ শুরু করার আগে আমি মেনলি যেটা করি, স্ক্রিপ্ট বারবার পড়ি। যতক্ষণ না স্ক্রিপ্টটার সঙ্গে একাত্ম হতে পারছি ততক্ষণ পড়তে থাকি।

সুবিধা : মেঘে ঢাকা তারা ছবিতে অভিনয়ের জন্য নিজেকে কতটা প্রস্তুত করতে হয়েছিল?

অনন্যা : মেঘে ঢাকা তারার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাছাড়া আমি ঋত্বিক ঘটকের ছবিগুলো আবার দেখেছিলাম। বিশেষত 'যুক্তি তক্ক গপ্পো।' আমি সুরমা ঘটকের সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করেছি। দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছি। যখন থেকে স্ক্রিপ্ট হাতে পেয়েছি কতগুলো জিনিস আমি ধাপে ধাপে করেছি। যেমন ঋত্বিক ঘটক এবং সুরমা ঘটকের একটা ছবি আমার ঘরে, মেক-আপ রুমে সর্বক্ষণ রাখা থাকত। এমনও হয়েছে, শুটিংয়ের লোকেশনে যাচ্ছি আমার ড্রাইভিং সিটের পিছনে ছবিটা রয়েছে। সব সময় চোখের সামনে বিষয়টি থাকত।

সুবিধা : উদ্দেশ্য ছিল ঋত্বিক এবং সুরমা ঘটকের দাম্পত্যের কেমিস্ট্রিকে চিনে নেওয়া তাইতো?

অনন্যা : কোনও জিনিস যদি সারাক্ষণ চোখের সামনে থাকে সেটা একেবারে জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে যায়। এটা বেসিক সাইকোলজি মানুষের। সেই ভাবনাতেই ভর করে প্রস্তুতি ছিল। তবে এটার একটা ফ্লিপ সাইডও ছিল। বিষয়টাতে একেবারে বিতৃষ্ণা হয়ে যেতে পারত। তবে এক্ষেত্রে তা হয়নি।

সুবিধা : বর্তমান পরিচালকদের মধ্যে আপনার প্রিয় কে?

অনন্যা : রানা, সুদেষ্ণাদি কে বাদ দিলে, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে এঁদের কথাই মনে পড়ছে। আরও অনেককেই পছন্দ করি হয়ত। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। ভেবে বলতে হবে।

সুবিধা : পরিচালক হিসাবে ঋতুপর্ণ ঘোষ অন্যদের থেকে কোথায় আলাদা?

অনন্যা : ঋতুদার এক্সপার্টাইজ অসাধারণ এটা আমার মনে হয়।

সুবিধা : টেলিভিশন কী একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন?

অনন্যা : এই মুহূর্তে টেলিভিশনে কাজ করছি না। তবে ভবিষ্যতে সুবর্ণলতার মতো ইন্টারেস্টিং কিছু পেয়েছি মনে হলে, নিশ্চয়ই করব।

সুবিধা : টেলিভিশন দেখেন?

অনন্যা : নিয়মিত দেখা হয় না। সময় হয়ে ওঠে না। তবে মাঝে মধ্যে সময় পেলে সারেগামাপা রিয়্যালিটি শো দেখি।

সুবিধা : অভিনেত্রী অনন্যা চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে দর্শকদের কৌতূহলের শেষ নেই।

অনন্যা : (হেসে) আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে দর্শকদের যে কৌতূহল রয়েছে, আমি সেটা বজায় রেখে দিতে চাই। এই নিয়ে বেশি কিছু না বলাই ভাল।

সুবিধা : এবছর বা সামনের বছর ব্যক্তিগত জীবনে কি বিশেষ কোনও প্ল্যান আছে?

অনন্যা : না। এর মধ্যে তেমন কিছু প্ল্যান নেই। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এই মুহূর্তে তেমন কিছু ভাবছি না। আপাতত কাজটাই প্রথম প্রায়োরিটি।

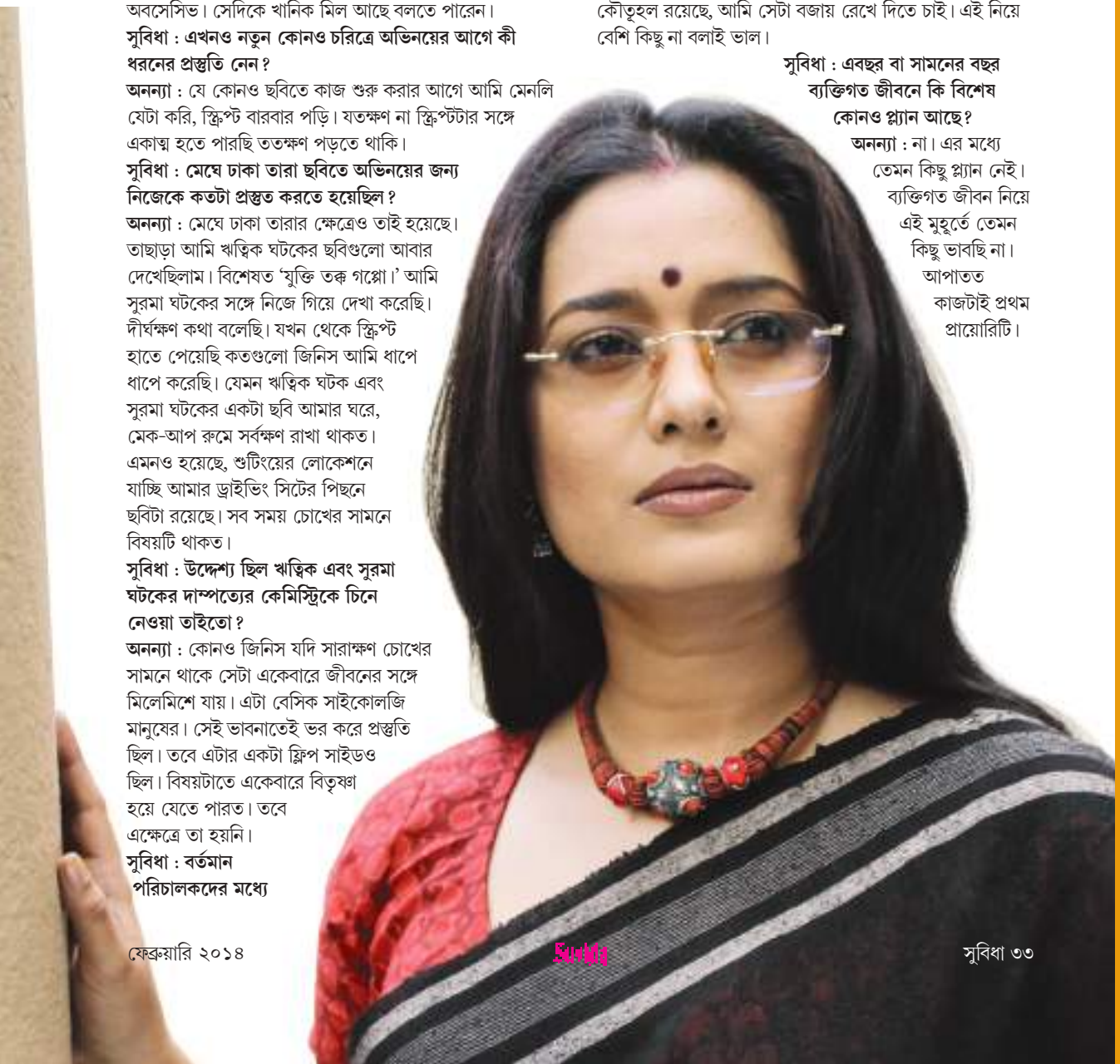

উত্তর কলকাতায় প্রথম কিডনির অসুখে উন্নত প্রযুক্তিগত

লেজার সার্জারি

LASER SURGERY
HOLMIUM

@Eskag SANJEEVANI Bagbazar

	TURP	LASER
1 Invasiveness	Minimum	Minimum
2 Post operative Pain	Minimum Pain	Painless
3 Energy used	Electric	Laser beam
4 Hospital Stay	More	Less
5 Resume normal Activities	Late	Early
6 Blood Loss	Yes	Negligible
7 Sexual side effect	Present	Nil
8 Anticoagulant taking Pt	Need to stop	No need to stop
9 Normal saline resection	Not possible	Possible

২৪x৭ দিন একই ছাদের তলায় পাবেন
সবরকম আধুনিক চিকিৎসা ও অসুখ অনুসন্ধান পদ্ধতি

সিটি স্ক্যান

মাল্টি স্লাইস

+ এমারজেন্সি
+ ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট
+ ডায়ালিসিস
+ কম্পিউটার চালিত প্যাথলজিকাল অনুসন্ধান পদ্ধতি
+ আধুনিক অসুখ নির্ণয় প্রযুক্তি

- খরচ আয়ত্ত্বের মধ্যে
- হাসপাতালের রোগী বা অনুন্নত শ্রেণীর রোগীদের জন্য পি পি পি রেট চালু
- গত কয়েক বছর সরকারি ও সরকারি আন্ডারটেকিং সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসাক্ষেত্রে জড়িত

Renew life afresh

Eskag SANJEEVANI MULTISPECIALITY HOSPITAL

ESKAG SANJEEVANI PVT. LTD.

For any kind of Information/Assistance
Please Feel Free To Contact Ph: 4025 1800,2554 1818(20 Lines)
Website: www.eskagsanjeevani.com /E-mail: info@eskagsanjeevani.com

থাইরয়েড। শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন শরীরের মেটাবলিজম্ নিয়ন্ত্রণ করা থেকে শুরু করে মস্তিষ্কের বিকাশ, এমনকী গর্ভ ধারণের ক্ষেত্রেও বিরাট ভূমিকা পালন করে। যদিও ইদানীং বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে থাইরয়েড সংক্রান্ত সমস্যার হার বাড়ছে লক্ষণীয়ভাবে। এর কারণ কী? কোন বয়সে মূলত সমস্যাটা হচ্ছে? এর ফলে সন্তানধারণেও কি সমস্যা হতে পারে? থাইরয়েডের অসুখ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিশিষ্ট এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ডাঃ সুজয় রায়চৌধুরী

থাইরয়েড নিয়ে কিছু কথা

প্রশ্ন : ছেলে না মেয়ে —কাদের মধ্যে থাইরয়েডের সমস্যা বেশি হচ্ছে?

উত্তর : অবশ্যই মেয়েদের মধ্যে এই অসুখের হার বেশি। আনুপাতিক হারে বলতে হয়, ২:১ অর্থাৎ ২ জন মেয়ের হলে একজন পুরুষের হচ্ছে।

প্রশ্ন : এর কারণ কী?

উত্তর : জেনেটিক ফ্যাক্টর একটা কারণ। কারও পরিবারে মা, দিদি বা ভাইয়ের এ সমস্যা থাকলে তারও অসুখটা হতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত স্ট্রেস, খাদ্যাভাসের পরিবর্তন, শারীরিক এক্সারসাইজ না করার কারণেও থাইরয়েড গ্রন্থির অসুখের আশঙ্কা থাকে।

প্রশ্ন : কোন বয়সে হয়?

উত্তর : হতে পারে যে কোনও বয়সেই। তবে তুলনামূলকভাবে বয়ঃসন্ধিকালে, প্রেগন্যান্সির সময় এবং মেনোপেজের পর এই তিনটে সময় একটু বেশি চান্স থাকে। যদিও অসুখটা যে কোনও বয়সেই হতে পারে।

প্রশ্ন : অসুখের ধরণ কত রকমের?

উত্তর : মূলত দু রকমের। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে হরমোন বেশি নিঃসৃত হলে হয় হাইপার থাইরয়ডিজম্ আর কম নিঃসৃত হলে হাইপো থাইরয়ডিজম্ । স্বাভাবিকভাবেই কম বা বেশি যে পরিমাণেই নিঃসৃত হোক না কেন তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ওষুধ খেতে হয়।

প্রশ্ন : দু ধরনের অসুখের লক্ষণ কী?

উত্তর : হাইপার থাইরয়ডিজম্ -এর লক্ষণ হল ওজন কমে যাওয়া, গলার সামনের দিক ফুলে যাওয়া, চোখ বড় হয়ে যাওয়া, অত্যাধিক গরম লাগা, বুক ধড়ফড় করা। অন্যদিকে হাইপো থাইরয়ডিজম্-এর লক্ষণ হল শরীর ফুলে যাওয়া, মোটা হওয়া, ক্লান্তিবোধ, কাজে অনীহা, হাত-পা ঝিন ঝিন করা, ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া, চলা-ফেরায় শ্বাসকষ্ট, শরীরে অস্বস্তিভাব বা ইরিটেশন, পিরিয়ডের সমস্যা, কনস্টিপেশন, ফার্টিলিটি ও পিরিয়ডের গন্ডগোল হতে পারে।

প্রশ্ন : চিকিৎসা কী?

উত্তর : অবশ্যই ওষুধ খাওয়া। তার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া এবং জীবনযাপনে কিছু পরিবর্তন আনা। হাইপার থাইরয়েডের জন্য অ্যান্টি থাইরয়েড সিক্রিশনের ওষুধ দিতে হয়। নিয়মিত ওষুধ একটু বেশিদিন ধরে খেলে অনেক সময় এই সমস্যা পুরোপুরি চলে যায়। কারও ক্ষেত্রে সারাজীবন। ২-১টি ক্ষেত্রে যদি কোনও ইনফেকশনের কারণে এই সমস্যা হয় তাহলে ওষুধ বন্ধ হতে

পারে। অন্যথায় খেয়ে যেতে হয় সারা জীবন।

প্রশ্ন : এর কোনও সাইড এফেক্টস আছে কি?

উত্তর : একেবারেই না। বরং ওষুধ বন্ধ করে দিলে ক্ষতি হতে পারে। অনেকেই কিছুদিন ওষুধ খাওয়ার পর যখন দেখেন থাইরয়েড লেভেল স্বাভাবিক তখন ওষুধ বন্ধ করে দেন। বন্ধ করার কিছুদিনের মধ্যে আবার শরীর ফুলে যাও।া চলাফেরার সময় শ্বাসকষ্ট, পিরিয়ডের সমস্যা দেখা দিতে পারে। কাজেই নিজে

থেকে ওষুধ বন্ধ করা কখনওই উচিত নয়। সেক্ষেত্রে নার্ভ, হার্ট-এরও ক্ষতি হতে পারে।

প্রশ্ন : হাইপোথাইরয়েডিজম-এর জন্য কি বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে?

উত্তর : হাইপোথাইরয়েডের জন্য পুরো শরীরের মেটাবলিজম যায় কমে। ফলে রিপ্রোডাকটিভ অরগ্যান থেকে প্রতিমাসে মেয়েদের যে ডিম্বাণু স্বাভাবিকভাবে বেরনোর কথা তা বেরোয় না। ফলে কন্‌সিভ করতে সমস্যা হয়। এছাড়াও এই সমস্যার জন্য ইউটেরাস ভারী হয়ে যায়, ওজন বাড়ে, সেক্সুয়াল এনার্জি কমে যায়। বন্ধ্যাত্বের জন্য এসব সমস্যাও দায়ী। এমনকী থাইরয়েড লেভেল ঠিক না থাকলে কনসিভ করার পরেও অ্যাবরশন হয়ে যেতে পারে। তাই থাইরয়েড স্বাভাবিক পর্যায়ে এনে ঋতুস্রাব কন্ট্রোল করে তারপর কনসিভ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

অনেক সময় সাবক্লিনিকাল হাইপোথাইরয়ডিজম্ দেখা দেয়। অর্থাৎ আগে থেকেই থাইরয়েডের হরমোনের ঘাটতি ছিল। কিন্তু রোগলক্ষণ সেভাবে প্রকাশ না পাওয়ায় তা নির্ণয় করা হয়নি। কিন্তু যখন প্রেগন্যান্সি না আসার জন্য চিকিৎসকের কাছে যান তখনই পরীক্ষায় ধরা পড়ে থাইরয়েডের সমস্যা। আবার কারও কারও ক্ষেত্রে প্রেগন্যান্সি আসার পর ২-৩ মাসে যখন রুটিন চেকআপ করা হয় তখন ধরা পড়ে হাইপোথাইরয়ডিজম। পরীক্ষায় দেখা যায় টি এস্ এইচ্ অনেকেই বেড়ে গিয়েছে। চিকিৎসা শুরু করতে হবে তখনই।

প্রশ্ন : কিন্তু এতে মিসক্যারেজের সমস্যা দেখা দেবে না তো?

উত্তর : গর্ভাবস্থায় কিংবা তার আগে যখনই হাইপোথাইরয়ডিজম্ ধরা পড়ুক না কেন ওষুধ কখনওই বন্ধ করা যাবে না। গর্ভাবস্থায় ওষুধ না খেলে মিসক্যারেজ বা প্রি ম্যাচিওর ডেলিভারি হতে পারে। এমনকী গর্ভস্থ ভ্রূণের ডেভেলপমেন্টের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। শিশুর ওজন অনেক বেড়ে যেতে পারে, শিশু জড়বুদ্ধিসম্পন্নও হতে পারে। কাজেই চিকিৎসকের পরামর্শমতো নির্দিষ্ট ডোজে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন : পুরুষদের থাইরয়েডের জন্যও কি ইনফার্টিলিটি দেখা দিতে পারে?

উত্তর : হ্যাঁ, পুরুষদের থাইরয়েডের জন্যও বন্ধ্যাত্বের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই অসুখে পুরুষের যৌন ক্ষমতা কিছুটা কমে যায়।

প্রশ্ন : মায়ের অনিয়ন্ত্রিত থাইরয়েড থাকলে গর্ভস্থ ভ্রূণের ওপর কী কী প্রভাব পড়তে পারে?

উত্তর : শিশুর বুদ্ধি অস্বাভাবিক হতে পারে, বাচ্চার স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা হতে পারে, ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য বিশেষ করে প্রথম দিকে মার থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে হরমোন দরকার। না হলে নানা সমস্যা হতে পারে।

প্রশ্ন : বলা হয়, থাইরয়েডের সমস্যা হলে খাওয়া-দাওয়ায় কিছু নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। সেটা কি ঠিক?

উত্তর : খুব বেশি খাওয়াদাওয়ায় বাছবিচারের দরকার হয় না। হাইপো থাইরয়েডে মোটা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে বলে লো ক্যালরিযুক্ত খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। দিনে ১৫০০ ক্যালরির বেশি খাবার খাওয়া ঠিক নয়। অনেক সময় আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে থাইরয়েডের সমস্যা হয়। যার ফলে গয়টার বা গলগন্ড হয়। এরকম ক্ষেত্রে আয়োডিন যুক্ত খাবার খেতে হয়। আয়োডাইজড লবণ, সামুদ্রিক মাছ খেলে আয়োডিনের ঘাটতি মেটে। তবে দু ধরণের খাবার গয়টারে বারণ করা হয়। যেমন বাঁধাকপি, এবং সয়াবিন। বাঁধাকপি, ব্রকোলি ইত্যাদিতে থাকে গয়টোজেনিক সাবস্ট্যান্স যা থাইরয়েডে প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়া সুস্থ থাকার জন্য ব্যালান্সড ডায়েট নিতে হবে। রোল, চাউমিন ইত্যাদি ফাস্ট ফুড এড়িয়ে চলতে হবে। থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে প্রেগন্যান্সির সময় বেশি ক্যালরির প্রয়োজন। কী কী খেলে সেই চাহিদা মিটবে তা চিকিৎসকের পরামর্শে খেতে হবে। নিজে থেকে ঠিক করলে হবে না।

প্রেমের দশকাহন

ফেব্রুয়ারি মাস প্রেমের মাস, কারণ এ মাসেই 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।' এ মাসেই একই সঙ্গে সরস্বতী পুজো ও ভ্যালেন্টাইনস ডে। তাই প্রেম সংক্রান্ত কিছু অম্লমধুর কথোপকথন উপস্থাপনা করেছেন অনিশা দত্ত

১ প্রথম বন্ধু : তুই নাকি একসঙ্গে পাঁচটা প্রেমপত্র দিয়েছিস?
দ্বিতীয় বন্ধু : একজন না একজন তো উত্তর দেবেই!

২ প্রেমিকা : আজ আমার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিও না।
প্রেমিক : কেন? কী হল?
প্রেমিকা : বাবা গতকাল জুয়াতে সর্বস্ব হেরে এসেছেন।
প্রেমিক : কোই বাত নেহি। আমিই তো ওঁকে জুয়ায় হারিয়েছি।

৩ বস তরুণি সেক্রেটারির ঘরে ঢুকে দেখেন এক কর্মচারী তরুণীকে চুম্বন করছে। রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, 'তোমাকে কি আমি এই জন্য বেতন দিয়ে রেখেছি?'
কর্মচারী : না স্যর, এটা আমি বিনা পারিশ্রমিকেই করে থাকি।

৪ প্রথম বান্ধবী : কখনও ভুলেও ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার বা টেনিস প্লেয়ার বিয়ে করবি না।
দ্বিতীয় বান্ধবী : কেন?
প্রথম বান্ধবী : ওদের কাছে 'Love' মানে শূণ্য।

৫ 'রজকীনী প্রেম নিকষিত হেম,
কামগন্ধ নাহি তায়...'
অর্থাৎ : 'Platonic love is pure gold!'

৬ ছেলে : মা এই যে আমার প্রেমিকা। ওকে তোমার বউমা করে নাও।
মা : ও মা, ও কি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে নাকি?
ছেলে : না না, ও মোটেও তেমন মেয়ে নয়। আমিই ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছি।

৭ প্রথম বন্ধু : আমার প্রেমিকার অন্য একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। এবার কী হবে?
দ্বিতীয় বন্ধু : কী আবার হবে। সন্তান সন্ততি হবে!

৮ সন্ন্যাসী : মদ খেলে প্রেমের প্রত্যাখ্যানের দুঃখ ভোলা যায় না। মদ খাওয়া ছাড়ুন।
মাতাল : তাহলে আপনি জপ তপ ছাড়ুন। গঙ্গাজল খেয়েও তো প্রেমের দুঃখ ভোলা যায় না।

৯ রাম : এখনও কি সেই মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করছিস?
শ্যাম : না, অন্য মেয়ে জুটে গেছে।
রাম : সেই মেয়েটার কী হল?
শ্যাম : সেই মেয়েটাকে তো বিয়ে করে ফেলেছি।

১০ যদু : প্রেমের সংজ্ঞা কী?
মধু : প্রেম? 'তারে আমি রাখিয়া এলেম অপরিবর্তন অর্ঘ্য!'
যদু : তারপর? তুই কি পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে যাস?
মধু : আলবাৎ! 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে কে, কোথায় ধরা পড়ে কে জানে?'

‘লক্ষ্মী মেয়ে’, নয় কেন ‘সরস্বতী মেয়ে’?

পুরাণ থেকে মনের উড়ান, যুক্তি-তর্ক সাজালেন রমাপদ পাহাড়ি

অনাদিবাবুর এই হয়েছে জ্বালা। রাতদিন প্রশ্ন আর প্রশ্ন। প্রশ্নের গুঁতোয় জীবনটা ছিটকে ছটাস। কতবার যে মেয়ের প্রশ্নে স্রেফ বোল্ড আউট হতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তিনি কি সার্চ ইঞ্জিন ‘গুগুল’ নাকি যে সব প্রশ্নের উত্তর তাঁর ঠোঁটের ডগায় থাকবে। কে যেন বলেছিল, ছোটোদের মনে প্রশ্ন জাগলে জিজ্ঞাসা করে বড়দের আর বড়দের মনে প্রশ্ন জাগলে তারা জিজ্ঞেস করেন গুগলকে। কিন্তু অনাদিবাবুর বাড়িতে ইনটারনেটের উঁকি-টুকি মারার জো নেই, কারণ মেয়ে নাকি ওসবের পাল্লায় পড়ে গেঁজিয়ে যেতে পারে। অনাদিবাবুর স্ত্রী সুমিত্রা, মেয়েকে মোবাইল ফোন পর্যন্ত ব্যবহার করতে দেন না।

শান্তা। অনাদি-সুমিত্রার একমাত্র মেয়ে। বাবার ধাত পেয়েছে। মফস্বল অঞ্চলে বেড়ে উঠলেও স্কুলে-পাড়ায়-ব্লকে-জেলায় ক্যুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সে সেরার সেরা। পড়াশোনাতেও বেশ এগিয়ে। এহেন মেয়ের জন্য বাড়িটাকে বইয়ের স্তূপ বানিয়ে ফেলেছেন অনাদিবাবু। নিজেও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নানা ক্যুইজ, ধাঁধা, স্লোগান, পাজল প্রভৃতি সমাধান করে মাঝে মধ্যেই পুরস্কার জেতেন। স্কুলশিক্ষক অনাদিবাবুর আরেকটি নেশাও রয়েছে। মাঝে মধ্যেই পুরাণ-টুরান খুলে নিয়ে বসেন। বামুনের ছেলে। চেষ্টা করেন সংস্কৃত মন্ত্রে-র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জেনে বুঝে সেগুলি উচ্চারণ করতে।

সামনেই সরস্বতী পুজো। বাড়িতে, এমনকী স্কুলেও পুজোটা অনাদিবাবুকেই সারতে হয়। তাই সেদিন সন্ধেবেলায় ‘মা সরস্বতীর পূজার্চনাদি’ নামের বইটি খুলে গুনগুন করে মন্ত্রতন্ত্র আওড়াচ্ছিলেন তিনি। এমন সময় হাজির ‘বক্তিয়ার খিলজি’ শান্তা। একঝাঁক প্রশ্ন নিয়ে। —বাবা, চাঁদের পাহাড়ের শঙ্কর কি খেতে না পেয়ে শকুন পুড়িয়ে খেয়েছিল? একটা পত্রিকায় লিখেছে, চাঁদের পাহাড় উপন্যাসটাকে গ্রাফিক নভেল হিসাবে বের করা হচ্ছে। বাবা, ‘গ্রাফিক নভেল’ কী? বাবা, সিনেমায় যে বুনিপ দেখিয়েছে, সেটা তো উপন্যাসে নেই, তাহলে উজবুকের মতো কোত্থেকে উড়ে এনে জুড়ে দিয়েছে? আচ্ছা, রক্ত মেখে কেউ কি কখনও সিংহের টোপ হিসাবে নিজেকে ব্যবহার করে?

অনাদিবাবুর কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকিয়েই চলে শান্তা। প্রশ্নবাণে জর্জরিত শান্তার সার্চ-ইঞ্জিন অনাদি ব্যানার্জি একসময় বলে ওঠেন, লক্ষ্মী মেয়ে আমার, একটু রেহাই দে। সামনেই সরস্বতী পুজো। মন্ত্রতন্ত্রগুলো একটু ঝালিয়ে নিই, তারপর তোর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

ধাঁ করে প্রশ্নটা করে বসে শান্তা।—আচ্ছা বাবা, তুমি তো মা সরস্বতীকে এত মানো, কই কখনও তো আমাকে ‘লক্ষ্মী মেয়ে’ না বলে ‘সরস্বতী মেয়ে’ বলে ডাকো না!

—তুই এখন যাবি?

—হ্যাঁ, যাচ্ছি তো! কিন্তু কই বললে না তো, আমাকে তুমি কখনও ‘সরস্বতী মেয়ে’ বলে ডাকো না কেন?

আগে তো পেট, পরে মাথা। মা লক্ষ্মীর দয়া না হলে পেট ভরে না। আর পেট ভরলে তবেই পড়াশোনা-গানবাজনা-সাহিত্যচর্চা।

—ঠিক আছে, ডাকব এবার একটু খ্যামা দে, লক্ষ্মী মেয়ে আমার!

—এই তো আবার 'লক্ষ্মী মেয়ে' বলে ডাকলে, তাহলে 'সরস্বতী মেয়ে' নয় কেন?

—উফ্‌ফ্‌ফ্‌, তুই যাবি!

সুমিত্রাদেবী, পতিদেবকে বাঁচাতে সেদিন মেয়েকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। ক্ষণিকের জন্য হলেও অনাদিবাবু হাঁফ ছেড়েছিলেন। অথচ, মেয়ের কথাটা ঘুরেফিরে ভাঙা রেকর্ডের মতো তাঁর কানে বেজেই চলেছে— 'সরস্বতী মেয়ে' বলে ডাকো না কেন? প্রশ্নটা ঘুরতেই থাকে মাথার মধ্যে চরকির মতো।

অনাদিবাবু মনে করতে শুরু করেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্য পুরাণের কথাগুলো। মর্ত্যধামে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাকি শ্রী শ্রী সরস্বতী পুজোর প্রচলন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন মাত্র সাত বছর, তখনই তিনি মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পুজো করেছিলেন। এই পুজো স্বর্গ-মর্ত্য দুই লোকেই দেবতা, কিন্নর, ঋষি, মহর্ষি, রাজা-প্রজা সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে করে আসছেন। অনাদিবাবু এবার ভাবতে থাকেন মা সরস্বতীর বংশ পরিচয়ের কথা। একটি মত বলছে, সরস্বতী নাকি ব্রহ্মার মেয়ে। আরেক মতে কৃষ্ণ তাঁর পিতা। অন্য মতে বিষ্ণুর স্ত্রী। এক মতে ব্রহ্মা সরস্বতীর স্বামী। কোথাও আবার ব্রহ্মার বোন রূপে সরস্বতীর পরিচয়। এক জায়গায় আবার তিনি ইন্দ্রের মা। অনাদিবাবু এবার ভির্মি খেতে শুরু করেন। নানা মুনির নানা মতের মতো কথা যদি মেয়ে একবার জানতে পারে, তাহলে প্রশ্নে-প্রশ্নে তাঁর অবস্থার সাড়ে বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।

আচ্ছা, মেয়েকে কি এই গল্পটা বলা যায়? গঙ্গা, লক্ষ্মী আর সরস্বতী—তিনজনেই বিষ্ণুর স্ত্রী। তিন সতীন। আর 'সতীন' মানেই তো একে অপরের সঙ্গে চুলোচুলি। সেদিন বৈকুণ্ঠে তুমুল ঝগড়া। স্বর্গের ঝগড়া বলে কথা। সেখানে শাপ-শাপান্ত মাস্ট। কী শাপ? না, 'তোকে মর্ত্যে নদী হয়ে জন্মাতে হবে! এই আমি বলে দিলুম। আর সেই নদীতে যত পাপী-তাপীরা আসবে, তারা চান করবে তোর জলে। তাদের যত পাপের বোঝা, সব তোকেই বইতে হবে! এই আমি বলে দিলুম!' —এই শাপশাপান্ত কোনও একজনের নয়, প্রত্যেকে প্রত্যেককে দিয়েছেন। দেবীর শাপ বলে কথা, অতএব 'ফলিবেই ফলিবে'। হয়েছেও তাই। গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী তিন দেবীকেই নামতে হয়েছে মর্ত্যে। নদীরূপে। একমাত্র নাম বদলে গেছে মা লক্ষ্মীর। মর্ত্যবাসী তাঁকে চেনে পদ্মা নামে। সরস্বতী নদীর দুই তীরে আর্য ঋষিরা নিত্য বেদপাঠ করেছেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা করেছেন। সেই পাঠ শুনেছেন সরস্বতী। তাঁর জিভ থেকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে বেদমন্ত্র। সরস্বতী হয়ে উঠেছেন বেদস্বরূপা। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। একরূপে তিনি নদী হলেও, অন্যরূপে তিনি বীণাপুস্তকধারিণী। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদায়িনী। অন্ধকারনাশিনী।

এইসব পুরাণকথা না হয় মেয়েকে শোনালেন অনাদিবাবু। কিন্তু এর দ্বারা 'সরস্বতী মেয়ে' নয় কেন, নাঃ বোঝানো যাবে না। আবারও তিনি পুরাণকথা ঘাঁটতে থাকেন। দেখেন, কোনও কোনও পুরাণে সরস্বতীর কুরুচিকর কাহিনির ছড়াছড়ি। শিবপুরাণ খুলে বসলেন। সেখানে পেলেন, ব্রহ্মা বসে ধ্যান করছেন। ধ্যানের ফলে তাঁর শরীরে সত্ত্বগুণ ক্রমশ জাগছে। সেই সত্ত্বগুণই এক পরমাসুন্দরী বিদুষী কন্যার রূপ ধরে ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। ব্রহ্মা তাঁর নাম রাখলেন 'সরস্বতী'। মেয়েকে ডেকে ব্রহ্মা বললেন, শোনো মা, তুমি সকলের জিভের ডগায় অবস্থান করবে। এছাড়া নদীর রূপ ধরে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে।

মেয়ে সরস্বতী, বাবার কথায় রাজি। কিন্তু কেলেঙ্কারিটা যে হওয়ারই ছিল। হল কী, ব্রহ্মা নিজেই সরস্বতীর রূপজালে জড়িয়ে পড়লেন। পিতা ব্রহ্মা সরস্বতীর পিছু নিলেন। স্বভাবিকভাবেই, সরস্বতীর লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার অবস্থা। তিনি ব্রহ্মার হাত থেকে বাঁচতে এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করেন। কিন্তু স্বর্গধামের কাণ্ড, তাই সরস্বতী যেদিকে যান, সেদিকেই ব্রহ্মার একটি করে মুখ গজিয়ে ওঠে। নিরুপায় সরস্বতী অবশেষে ওপরের দিকে উঠে গেলেন। ব্রহ্মা মাথার চাঁদি থেকে বের করলেন পাঁচ নম্বর মুখ। সরস্বতী তখন করলেন কী, ব্রহ্মাকে শাপ দিয়ে বসলেন, তোমার ওই পঞ্চম মুণ্ডু উড়ে যাবে। এরপরেও, কামশরে জর্জরিত ব্রহ্মার হাত থেকে মুক্তি পেলেন না সরস্বতী। ফল, পুত্রলাভ। সেই ছেলেই নাকি 'মনু'। যাঁর বংশধর আমরা মানুষেরা। সরস্বতীর নামে পেলেও, মা লক্ষ্মীর নামে অতশত বদনাম-মার্কা কাহিনি খুঁজে পেলেন না অনাদিবাবু। যেটুকু আছে, তা ছুটকোছাটকা।

এমন সময় বামুন-কাম শিক্ষক-কাম শান্তার সার্চ ইঞ্জিন অনাদিবাবুর মনে পড়ে যায় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের লেখা 'সরস্বতী' বইটির কথা। পাতা উল্টে দেখেন, আমাদের দেশে নাকি এই সেদিনও সরস্বতীর মূর্তিপূজার প্রচলনই ছিল না। অমূল্যচরণ বইটি লিখেছেন ১৩৪০ বঙ্গাব্দে। এখন ১৪২০। আশি বছরের ফারাক। যাইহোক, তিনি উল্লেখ করেছেন, 'সত্তর-আশি বৎসর পূর্বে, কলিকাতায় গণিকাদের বাড়িতে কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে সরস্বতী পূজায় বেজায় ধুম হইত।' তাছাড়া, গণিকালয়ে দুটো পূজোর খুব রমরমা ছিল—কার্তিক এবং সরস্বতীর। বিদ্যাভূষণমশাই বলছেন, 'সরস্বতী নিজে স্ত্রী দেবতা, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অঞ্জলি দিতে পাইত না। বাঙালির বোধহয় ভয় ছিল, পাছে মেয়েরা দেবীর অনুগ্রহে লেখাপড়া শিখিয়া ফেলে।' এই তো ক্লু পেয়েছেন অনাদিবাবু, 'সরস্বতী মেয়ে' না বলার। কিন্তু পতিতালয়ের খবর কি মেয়ের কানে তোলার মতো? তাছাড়া মা সরস্বতীকে যখন তারা বিদ্যার দেবী রূপে মান্যিগণ্যি করে! তাহলে?

বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের লোককথাটা যেন মনে পড়ে যায় অনাদিবাবুর। ছোটোবেলায় শুনেছিলেন, বেঁটে মতো ভদ্রলোক ঢোল বাজিয়ে নেচে নেচে গল্প শোনাতেন দুর্গা পরিবারের— 'আর রইল বাকি দুজনা, কাত্তিক আর সরস্বতী—চিরকুমার আর চিরকুমারী।' তার মানে সরস্বতী চিরকুমারী, কিন্তু বাঙালি মা মাত্রেই চান, তাঁর মেয়ে বেশ জমিয়ে সুখে-ঐশ্বর্যে ঘরসংসার করুক। তাই হয়তো 'সরস্বতী মেয়ে' কথাটা মুখে তুলতে চান না!

এটা বোধহয় মেয়েকে বলা যায়! অনাদিবাবু খুঁজতে থাকেন আরও তথ্য। শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিগুলো বেজায় টাটকা হয়ে ওঠে তাঁর। মাঘের উতাল হাওয়া। সরস্বতী পুজোর ঢের আগে থেকেই মেয়েদের স্কুলে উঁকিঝুঁকি। স্কুলের পক্ষ থেকে নেমন্তন্ন কার্ড পৌঁছে দিতে হবে কাছে পিঠের 'গার্লস' স্কুলে। আর পুজোর দিন মানে তো কথাই নেই। চেনা মেয়েটা সেদিন হলুদশাড়িতে বিনুনি দুলিয়ে রেখা-হেমা-মধুবালু-সুচিত্রা। সংযুক্তা-শাশ্বতী-লীনা-অর্চনা। যে কোনও ছুতোয় সেদিনের অপ্সরাদের ছোঁওয়া পাওয়ার জন্য ছোঁকছোঁক। বুকের মধ্যে অহরহ দামামা। স্কুল চত্বর থেকে উড়ে আসছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে...'। হায়, কেউ যদি রোগা-পাতলা-দুবলা ছেলেটাকে চিনত! যে তার 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল'! স্মৃতির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে যুক্তি-বুদ্ধির দুনিয়ায় ফিরে আসেন অনাদি। মনে করতে থাকেন, মা সরস্বতীকে যতই ছেলেপুলেরা 'ম্যা-ম্যা' করে ডাকতে থাকুক, তবুও কতটা জবজবে ভক্তি-শ্রদ্ধা আদায় করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তিনি! সত্যিই কি, সরস্বতীর মূর্তি দেখে তেমন কোনও মাতৃভাব জাগে? পেখমমেলা হাঁসের বাহারি ঘেরাটোপে সরস্বতী। সিন্ডারেলা নাকি! নাকি কোনও পরী! কেমন যেন সেই বয়সেই রক্ত চলকে উঠত। সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্রটা মনে করেন অনাদি।

ওঁ তরুণসকল মিন্দোবিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভরণমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নমঃ।।

চাঁদের নতুন কলা, অর্থাৎ একফালি চাঁদ যিনি মাথায় ধারণ করে আছেন, যাঁর গায়ের রং সাদা, যিনি কুচভরণমিতাঙ্গী (অর্থাৎ স্তনভারে যাঁর শরীর নুয়ে পড়েছে) যিনি সাদা পদ্মের ওপর বসে আছেন, হাতে যাঁর কলম আর বই, সেই বাগ্‌দেবী সমস্ত বিভবপ্রাপ্তির জন্য আমাদের রক্ষা করুন। —মা সরস্বতীর এমন আকর্ষণীয় শরীরী বর্ণনার গুণেই কি তিনি পতিতালয়ে একসময় ধুমধামের সঙ্গে পূজিতা হতেন? শুধু বিদ্যা নয়, বাদ্যি অর্থাৎ গান-বাজনায় পারঙ্গমতার জন্যও কি তিনি গণিকাদের এত আদরণীয়? তাছাড়া, সরস্বতী পুজোর দিনটাই তো তাঁদের আমলের ভ্যালেন্টাইন ডে!

অনাদি আরও যুক্তি খুঁজতে থাকেন। 'সরস্বতী মেয়ে' না বলার যুক্তি। বুদ্ধিকে প্রখর করে তোলেন। এবার আর পুরাণ নয়, একজন তার্কিকের চোখে দেখতে চান মা সরস্বতীকে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কুমোরপাড়ার ছবি। সাদার পাশাপাশি গোলাপি, হলুদ, কমলা, হাল্কা সবুজ প্রভৃতি নানা রঙে এখন ছয়-ইঞ্চি, আট ইঞ্চি থেকে লরিতেও আঁটানো যায় না এমন মূর্তি। কিন্তু পুরাণ বলছে সরস্বতী ধবধবে ফরসা, পরমাসুন্দরী। চাঁদ, কুন্দফুল, তুষারের মতো সাদা। মেমসাহেব। এমনকী শাড়ি-ব্লাউজও শ্বেতশুভ্র। বড় বড় টানা টানা পদ্মফুলের মতো চোখ। স্তনের ভারে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়েছেন। স্তনযুগলের ওপর মুক্তোর হার দুলছে। হাতে সাদা রুদ্রাক্ষের মালা। এছাড়া সাদা বীণা এবং বই। কখনও কলম ও বই। বসে আছেন সাদা পদ্মের ওপর। সারা গায়ে সাদা চন্দনের আতর। গায়ের গয়নাও সব সাদা ফুলের। বাহনটিও ধবধবে। তাই সরস্বতী, 'মানসে রমতাং নিত্যং সর্বশুক্লা সরস্বতী'।— এমন ফ্যাশনেবল দেবী মূর্তি শুধুই কি 'দেবী'? নাকি, আমাদের 'স্বপ্নেদেখা রাজকন্যা!'

সরস্বতীর অস্তিত্ব খুঁজতে গিয়ে অনাদি তখন সরস্বতীময়। হাতের কাছেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ। সেখানেই তো পড়েছিলেন,

—তুমি তো জানো না তুমি কে!
—কে আমি?
—তুমি সরস্বতী, শব্দটির মূল অর্থে
যদিও মানবী, তাই কাছাকাছি পাওয়া
মাঝে মাঝে নারী নামে ডাকি।
... ...
—তুমি দেবী, ইচ্ছে হয় হাঁটু গেড়ে বসি
মাথায় তোমার করতল, আশীর্বাদ
... ...
—কী চাও আমার কাছে?
—কিছু নয়। আমার দু-চোখে যদি ধুলো পড়ে
আঁচলের ভাগ দিয়ে মুছে দেবে?

অনাদি আবারও ভাবতে থাকেন, সরস্বতী আসলে কে? দেবী, নাকি পুরুষের মানসপ্রতিমা? তাছাড়া, এ সমাজে বিদ্যেবতীর চেয়ে যে অন্ন-লক্ষ্মীরই কদর বেশি। ঐশীর মায়ের কথাটা মনে পড়ে যায় অনাদির।

—জানো তো, এবারে সরস্বতী পুজোটা বেশ ধুমধামের সঙ্গে করতে হবে।

—কেন গো ঐশীর মা?

—আরে, মেয়েটা এবার মাধ্যমিক দেবে না!

—তাই বলো! আমার বাবা ওসব পাট চুকেই গেছে। ছেলে এবার ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করে চাকরিতে যোগ দিয়েছে।

তার মানে, বিদ্যা-বৈতরণী পার হতেই শুধু সরস্বতীর আরাধনা প্রয়োজন? গিভ অ্যান্ড টেক! এ পোড়া দেশে বিদ্যে না হলেও চলে, কিন্তু লক্ষ্মীকে ট্যাঁকে রাখতেই হয়। যে মেয়েটা কাগজ কুড়োয়, যে মেয়েটা স্বামীর সঙ্গে রাতদিন মাঠের কাজে হাত বাড়ায়, যে মেয়েটা পাঁচটা বিয়োনোর পরেও সংসার সামলে নেয়, যে মেয়েটা অন্যের বাড়িতে বাসন মাজে, ছেলে মানুষ করে, যে মেয়েটা দেশি মদ বিক্রি করে, যে মেয়েটা সংসার বাঁচাতে শরীর বেচে—তাদের ক-জন সরস্বতীর কৃপা পেয়ে সইটুকু করতে শিখেছে? তবুও তারা তাদের মা-বাবার কাছে, স্বামীর কাছে, সংসার-পরিজনের কাছে 'লক্ষ্মী মেয়ে'। কী প্রয়োজন 'সরস্বতী মেয়ে' হয়ে ওঠার? কিন্তু ক্লাস নাইনে পড়া মেয়ে শান্তাকে এসব 'বড়দের কথা' বোঝাবেন কীভাবে? তাই নিজের মনেই দু-একটা সহজ যুক্তি তৈরি করে নেন অনাদিবাবু।

মা সরস্বতী বছরে সাকুল্যে আসেন মাত্র দু-বার, একবার তাঁর মায়ের সঙ্গে, আরেকবার একা-একা শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে। অন্যদিকে মা লক্ষ্মী মায়ের সঙ্গে আসেনই, কোজাগরী রাতে এবং প্রতি বৃহস্পতিবার বাঙালির ঘরে ঘরে তাঁর সাপ্তাহিক ভ্রমণ। তাছাড়া পেটে বিদ্যে না নিয়েও তো একটি মেয়ে পৃথিবীতে কতরকম কাজই না করতে পারে। আগে তো পেট, পরে মাথা। মা লক্ষ্মীর দয়া না হলে পেট ভরে না। আর পেট ভরলে তবেই পড়াশোনা-গানবাজনা-সাহিত্যচর্চা। অনাদি মেয়েকে এও বলবেন যে, 'সরস্বতী' শব্দটি 'লক্ষ্মী'র চেয়ে একটু বড় শব্দ। 'সরস্বতী' উচ্চারণে জিভ কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে, দেশগাঁয়ের মানুষ সেই যে 'লক্ষ্মী মেয়ে' বলে কোন আদ্যিকাল থেকে ডাকতে শুরু করেছে, তা মুখে মুখে চলে আসছে অনাদি অনন্তকালধরে।

বাদবাকি ব্যাখ্যা না হয় মেয়ে বড় হয়েই জানবে। অনাদি মনে মনে মাথা ঠোকেন মা সরস্বতীর পায়ে। যুক্তি-তর্কগুলো একে একে ঠোঁটের ডগায় সাজিয়ে দেওয়ার জন্য। শিক্ষক-পিতা অনাদির মনে পড়ে যায়, ব্যাধের শরে ক্রৌঞ্চীর মৃত্যুতে শোকাহত বাল্মীকির কথা। ঠিক ওই সময় যদি মা সরস্বতী তাঁর কণ্ঠে-জিহ্বায় ঠাঁই না নিতেন, তাহলে পৃথিবীর প্রথম শ্লোকটি লেখা হত কি! লেখা হত কি রামায়ণের মতো মহাকাব্য!

ফেব্রুয়ারি মাস অর্থাৎ মাঘ-ফাল্গুন মাস কেমন যাবে তার আগাম কিছু আভাস দিচ্ছেন শ্রীগুপ্ত।

মেষ রাশি
মাসের শুরুটি ভাল হলেও শেষের দিকে মানসিক অবসাদ আসবে, তবে কর্মজীবনে উন্নতিলাভের সম্ভাবনা আছে। সন্তান স্থান শুভ। শুভ সংখ্যা : ৫ ; অশুভ সংখ্যা : ২ ; শুভ রঙ : সবুজ ; অশুভ রঙ : সাদা ; শুভ বার : বুধ ; অশুভ বার : সোম ; শুভ খাবার : বিট, গাজর ; অশুভ খাবার : পালংশাক।

বৃষ রাশি
বিয়ের ক্ষেত্রে শেষের দিকে শুভফল ঘটবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধির কারণে কিছুটা ফল খারাপ হতে পারে। হঠাৎ প্রাপ্তির যোগ আছে। শুভ সংখ্যা : ৬ ; অশুভ সংখ্যা : ৪ ; শুভ রঙ : আকাশি ; অশুভ রঙ : কালো ; শুভ বার : শুক্র ; অশুভ বার : শনি ; শুভ খাবার : বিট, গাজর ; অশুভ খাবার : মটরশুটি।

মিথুন রাশি
বিদেশযাত্রার সম্ভাবনা, কর্মজীবনে পদোন্নতির যোগ আছে। স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে। হঠাৎ বিয়ে হতে পারে, সন্তান লাভে শুভ। শুভ সংখ্যা : ৯ ; অশুভ সংখ্যা : ১ ; শুভ রঙ : লাল ; অশুভ রঙ : গোলাপি ; শুভ বার : মঙ্গল ; অশুভ বার : রবি ; শুভ খাবার : সামুদ্রিক মাছ ; অশুভ খাবার : ডিম।

কর্কট রাশি
নতুনভাবে ব্যবসা শুরু করলে ভাল হবে। একক নামে করতে হবে। সুতো, হোটেল, জমি এই সংক্রান্ত ব্যবসা শুভ। বিয়ের ক্ষেত্রে ছক বিচার করে বিয়ে দেওয়া দরকার। শুভ সংখ্যা : ১ ; অশুভ সংখ্যা : ৫ ; শুভ রঙ : গোলাপি ; অশুভ রঙ : সবুজ ; শুভ বার : রবি ; অশুভ বার : বুধ ; শুভ খাবার : মিষ্টি ; অশুভ খাবার : টক।

সিংহ রাশি
চলা ফেরা ও খাওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। হঠাৎ বিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে মতপার্থক্য, উচ্চশিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বাইরে যাওয়ার যোগ আছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বাত, স্নায়ুপীড়া, প্রেশার সংক্রান্ত ব্যাধিতে কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা। শুভ সংখ্যা : ৩ ; অশুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ রঙ : হলুদ ; অশুভ রঙ : ধূসর ; শুভ বার : বৃহস্পতি ; অশুভ বার : শুক্র ; শুভ খাবার : মুরগির মাংস মাছ ; অশুভ খাবার : চিংড়ি মাছ।

কন্যা রাশি
প্রেম প্রীতি ভালবাসা করে বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আগুন, জল, বিদ্যুৎ থেকে সাবধানে থাকতে হবে। কিছু ব্যবসায় লাভবান হতে পারেন। শেয়ার মার্কেটে অর্থলগ্নী করা উচিত নয়। শুভ সংখ্যা : ৮ ; অশুভ সংখ্যা : ৪ ; শুভ রঙ : নীল ; অশুভ রঙ : কালো ; শুভ বার : শনি ; অশুভ বার : মঙ্গল ; শুভ খাবার : ঘি, মাখন ; অশুভ খাবার : আটা।

তুলা রাশি
সংযমী জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয়তা আছে। বাড়তি দায়িত্ব বা ঝুঁকি নেওয়া উচিৎ হবে না। আর্থিক ক্ষেত্রে দূর ভ্রমণ শুভ। বিয়েও শুভ। শুভ সংখ্যা : ৭ ; অশুভ সংখ্যা : ৯ ; শুভ রঙ : ধূসর ; অশুভ রঙ : নীল ; শুভ বার : বুধ ; অশুভ বার : শনি ; শুভ খাবার : মেথির শাক, মাছ ; অশুভ খাবার : পালং শাক।

বৃশ্চিক রাশি
নিজে গাড়ি চালানো ঠিক নয়। দূর ভ্রমণে বাধা প্রাপ্তি, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি লাভের সম্ভাবনা বাধার ভিতর দিয়ে বিয়েতে লাবণ্য আসবে। শুভ সংখ্যা : ২ ; অশুভ সংখ্যা : ৬ ; শুভ রঙ : সবুজ ; অশুভ রঙ : মেরুন ; শুভ বার : বৃহস্পতি ; অশুভ বার : রবি ; শুভ খাবার : বেগুন ; অশুভ খাবার : করলা।

ধনু রাশি
অর্থলগ্নী করার উপযুক্ত সময়। গৃহ নির্মাণের জন্যেও শুভ। বিয়ে স্থির হয়ে ভেঙে যেতে পারে। মানসিক চাঞ্চল্যের কারণে। শিক্ষাক্ষেত্রে ফল খারাপ হতে পারে। শুভ সংখ্যা : ৫ ; অশুভ সংখ্যা : ৯ ; শুভ রঙ : গোলাপি ; অশুভ রঙ : সবুজ ; শুভ বার : রবি ; অশুভ বার : সোম ; শুভ খাবার : সোয়াবীন ; অশুভ খাবার : চিংড়ি মাছ।

মকর রাশি
হঠাৎ আত্মীয় বিয়োগ হওয়্যার সম্ভাবনা আছে। ব্যয়ভার বৃদ্ধি ঘটবে, ভ্রাতৃ বিরোধ হতে পারে। আটকে থাকা অর্থ প্রাপ্তি, শিক্ষা ও বিবাহ ক্ষেত্রে শুভ। শুভ সংখ্যা : ৯ ; অশুভ সংখ্যা : ৪ ; শুভ রঙ : লাল ; অশুভ রঙ : কালো ; শুভ বার : মঙ্গল ; অশুভ বার : শনি ; শুভ খাবার : আটার লুচি, জল ; অশুভ খাবার : মুসুর ডাল, বিট।

কুম্ভ রাশি
নতুনভাবে কর্মজীবনে উন্নতি ঘটবে ; একাধিক জায়গা থেকে অর্থ আসবে। তবে চলাফেরা, খাওয়ার ব্যাপারে সাবধান। বাইরের খাবারের মাধ্যমে বিষক্রিয়া হতে পারে। শুভ সংখ্যা : ৩ ; অশুভ সংখ্যা : ৮ ; শুভ রঙ : হলুদ , অশুভ রঙ : রুপোলি ; শুভ বার : বৃহস্পতি ; অশুভ বার : মঙ্গল ; শুভ খাবার : পিঁয়াজকলি ; অশুভ খাবার : মাটির নিচের আলু।

মীন রাশি
ব্যবসায় উন্নতি লাভ ঘটবে। শিল্প সাহিত্য চর্চায় মুক্ত ব্যক্তির লাভ হবে। হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি, বাড়ি, ঘর, জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রেও শুভ ফলের সম্ভাবনা। প্রেম করে বিয়ে হওয়ার যোগ আছে। শুভ সংখ্যা : ২ ; অশুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ রঙ : সাদা ; অশুভ রঙ : ধূসর ; শুভ বার : শুক্র ; অশুভ বার : শনি ; শুভ খাবার : মাছ ; অশুভ খাবার : মাছের ডিম ও মেটে।

চিন্তা নয়। চাই সুখ।

Suvida® 72

আফশোস থেকে আনন্দ

এমারজেন্সি জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল

REWEL

A Division of
Eskag Pharma

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

RNI NO.: WBBEN/2011/39356

Suvida®

কারণ সিদ্ধান্তটা আপনার

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

গর্ভনিরোধক বড়ি

স্বত্বাধিকারী সুনীল কুমার আগরওয়াল কর্তৃক পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক - বি কলকাতা ৭০০০৮৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড ১৩, ১৩/১ এ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদেষ্ণা রায়।